বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

মাসিক

নবীন কণ্ঠ

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

৩য় বর্ষ | ৩য় সংখ্যা
মার্চ, ২০২৪ খ্রি.

হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন;
রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, “সিয়াম ঢালস্বরূপ।
তোমাদের কেউ কোনো দিন সিয়াম পালন করলে তার
মুখ থেকে যেন অশ্লীল কথা বের না হয়। কেউ যদি
তাকে গালমন্দ করে অথবা ঝগড়ায় প্ররোচিত করতে
চায়, সে যেন বলে, আমি সিয়াম পালনকারী।”
—— সহিহ বুখারি: ১৮৯৪

নব্য ধারার বিশুদ্ধতায় নবীনকণ্ঠে লিখবে,
ইসলামি ও সাময়িকে পাঠক শ্রোতা শিখবে।

o.m. graphics

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

৩য় বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। মার্চ, ২০২৪ খ্রি.

মাসিক নবীন কণ্ঠ
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

প্রতিষ্ঠা
ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. / শাবান, ১৪৪৪ হি. / ফাল্গুন, ১৪২৮ ব.

উপদেষ্টা
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানি হা.

তত্ত্বাবধায়ক
মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী
মুহা. হাছিব আর রহমান
মাওলানা মাহফুজ হুসাইনী
মুফতী আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফী

প্রধান সম্পাদক
মাকামে মাহমুদ

সম্পাদক
উসমান বিন আ. আলীম

নির্বাহী সম্পাদক
বিন-ইয়ামিন সানিম

বিভাগীয় সম্পাদক
কাজী মা'রুফ
রাশেদ নাইব
শামসুল আরেফীন

Ramadan kareem

ব্যবস্থাপনায়
মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবায়ের,
মুফতী ইমদাদুল্লাহ, মুফতী মাসউদ আলিমী,
আনিসুর রহমান আফিফি,
মুহা. সায়েম আহমাদ, মুহাম্মাদুল্লাহ আহনাফ,
মুফতী ওলিউল্লাহ তাহসিন, তাওসীফ আহমাদ,
তাশরীফ আহমদ, জাবের মাহমুদ,
মাও. হাবিব উল্লাহ,জুবায়ের আহমেদ,
মুফতী সাইফুল্লাহ,
হুসাইন আহমদ, মুহা. আব্দুর রশীদ।

আস্থা ও বিশ্বাসের প্লাটফর্ম
তিজারাহ আসলী
(বাদাম, অরিজিনাল মধু, পারফিউম, ঘি, থ্রিপিস ও শাড়ি ইত্যাদি)

দৈনিক দেশচিত্র
যেখানে বাঙালি সেখানেই আমরা

যোগাযোগ

অস্থায়ী ঠিকানা : বলিয়ারপুর,সাভার, ঢাকা । সম্পাদক : ০১৭৮৯২০৪৬৭৪
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৪৭৬২৯৮০৯ ইমেইল : nobinkanthobnlf@gmail.com

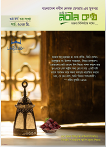

৩য় বর্ষ । ৩য় সংখ্যা
মার্চ-২০২৪

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে 'নবীনকণ্ঠ' এবারের সংখ্যায় যারা লিখেছেন:

লেখক সূচি

কুরআনের আলো

মুফতী ওলিউল্লাহ তাহসীন

হাদীসের আলো

মুফতী ওমর ফারুক হানযালা

প্রবন্ধ

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফী
মাওলানা আব্দুর রহমান
মুহাম্মাদ হাসীবুল হাসান
আলী ওসমান শেফায়েত
মুফতী আইয়ুব নাদীম
নিয়ামুল ইসলাম
শরিফ আহমাদ
সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম
ইকরামুল ইসলাম লিহান

ভ্রমণকাহিনি

হুসাইন আহমদ
রেজা কারিম

মুক্তগদ্য

ইব্রাহিম হাসান হৃদয়
শুয়াইব আল হামিদ
যাকারিয়া মাহমুদ
দ্বিপ্রহর

ছড়া/কবিতা

আবরার নাইম, রাশেদ নাইব,
মুহাম্মদ মুকুল মিয়া, আব্দুল আহাদ,
হা. ক্বারী মঈন উদ্দিন, চিত্তরঞ্জন সাহা,
সাদিয়া আক্তার, রিফ আহমেদ শান,
সারমিন চৌধুরী, মুহিত ইসলাম,
মুহাম্মদ আবুল কাসেম, অভিজিৎ দত্ত,
শামসুল আরেফীন, উম্মে আইমান তৃষা,
মাহবুবা আক্তার তামান্না

গল্প

ফয়সাল হাসান শুভ্র
নুসরাত জাহান জেরিন
নিলুফা মল্লিক
জুবায়ের আহমেদ
মেহেরুন ইসলাম
শেখ সজীব আহমেদ
তাশরীফ আহমদ

ইতিহাস

জুবায়ের মোল্যা

রোজনামচা

জাবেদ বিন তৈয়ব
সাদিয়া আক্তার
মাহবুবা সিদ্দিকা
রুকন উদ্দিন মাহমুদ
আমিন হাসান

অনুভূতি

শেখ মুহাম্মাদুল্লাহ আহনাফ
মাওলানা হাবিব উল্লাহ

Ramadan Kareem

নবীন কণ্ঠ
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে ...

পবিত্র মাহে রমজান: পুণ্য কামানোর শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

পবিত্র মাহে রমজান। এই মাস নাজাতের মাস। নিজের জীবনের সকল পাপ মোচনের মাস। বরকতময় মাস। দোয়া কবুলের মাস। এই বরকত ও ফজিলতপূর্ণ মাস হলো প্রতিটি মুমিনের জন্য পূণ্য কামানোর উৎসবের মাস। এই মাসে রোজার ফজিলত ও গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হবে কুরআনুল কারিমের একটি আয়াত থেকে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—'হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বনকারী মুত্তাকি-পরহেজগার হতে পারো। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই তার রোজা রাখে।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩-১৮৫) এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, রোজা একজন বান্দার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে এবং তা কতটা ফজিলতের।

রমজানের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ তাআলার কসম! মুসলমানদের জন্য রমজানের চেয়ে উত্তম কোনো মাস আসেনি এবং মুনাফিকদের জন্য রমজান মাসের চেয়ে অধিক ক্ষতির মাসও আর আসেনি। কেননা মুমিনগণ এ মাসে গোটা বছরের জন্য ইবাদতের শক্তি ও পাথেয় সংগ্রহ করে। আর মুনাফিকরা এতে মানুষের উদাসীনতা ও দোষত্রুটি

অন্বেষণ করে। এ মাস মুমিনের জন্য গনিমত আর মুনাফিকের জন্য ক্ষতির কারণ। (মুসনাদে আহমদ, হাদিসঃ ৮৩৬৮) রমাজানের ফজিলত সম্পর্কে মুসলিম শরিফের আরও একটি হাদিসে কুদসি বর্ণিত হয়েছে; আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'রোজা আমার জন্য, আর আমিই এর বদলা দেবো।' (সহিহ মুসলিমঃ ২৭৬৪)

এই ঘোষিত ফজিলতপূর্ণ মাস রমজান একজন মুমিনের জন্য নেয়ামতস্বরূপ এবং প্রত্যেক মুমিনের জন্য নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা জরুরি। আর এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় তখনই হবে, যখন একজন মুমিন দুনিয়ার সকল মোহ ত্যাগ করে, সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে, এই মাসকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাবে। আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কার মনে করে তা গ্রহণ করবে এবং সে এটাকে পুণ্য কামানোর মহা সুযোগ মনে করে পুরোপুরি আমলে লেগে যাবে। সুতরাং এই পবিত্র রমজান মাসে অধিক হারে নেক আমল করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য একান্ত আবশ্যক। এই ফজিলতপূর্ণ মাসে বেশি বেশি পুণ্য কামানোর জন্য নিম্নোক্ত আমলগুলো করা যেতে পারে। তাহলে এই মহিমান্বিত মাসের যথাযথ সম্মান রক্ষা হবে বলে আমি আশাবাদী।

১. রোজা রাখাঃ

যা প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকার জন্য ফরজ। যার ফজিলত আমরা উপরে বর্ণনা করে এসেছি।

২. বেশি বেশি কুরআন খতম ও তেলাওয়াত করাঃ

কেননা, এই কুরআন আপনার জন্য কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। এবং প্রতিটি হরফে আপনি ৭০ নেকি করে পাচ্ছেন। এতেই আপনার পুণ্যের ভান্ডার জমে যাচ্ছে।

মহানবি সা. বলেছেন, 'রোজা ও কুরআন কিয়ামতের দিন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিসঃ ৬৬২৬)

৩. কিয়ামু রমাদান তথা তারাবি নামাজ আদায় করাঃ

হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে সওয়াব হাসিলের আশায় রমজানে কিয়ামু রমাদান (সালাতুত তারাবি) আদায় করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিসঃ ২০০৯)

এতে হাদিসের উপর আমল করে তারাবি নামাজও আদায় হয়ে গেল।

৪. তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করাঃ

আমরা সাধারণত পুরো বছর তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করার সুযোগ পাই না। বিভিন্ন কারণে। তাই এই রমজান মাসে

তাহাজ্জুদ নিয়মিত পড়ার একটা সুযোগ থাকে, এজন্য আমরা এই সুযোগটাকে কাজে লাগাবো, ইনশাআল্লাহ। প্রতিদিন সেহরি খাওয়ার আগে বা পরে দু-চার রাকাত করে পড়ে নেব। হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রমজান মাস লাভকারী ব্যক্তি, যিনি উত্তমরূপে সিয়াম ও কিয়াম পালন করে, তার প্রথম পুরস্কার—রমজান শেষে গুনাহ থেকে ওই দিনের মতো পবিত্র হয়, যেদিন মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদিস: ৮৯৬৬)

৫. শেষ দশকে ইতিকাফ করা:

আমল করার একটা সুবর্ণ সুযোগ হলো ইতেকাফ। কারণ মসজিদে আমল করার মন-মানসিকতা ও পরিবেশ বজায় থাকে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মহানবি সা. রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১১৭১)

৬. উমরাহ আদায় করা:

রমজানে একটি উমরা আদায় করলে অন্য মাসে ৭০টি উমরাহ করার সওয়াব হয়। তাই এ মাসে উমরাহ আদায় করাটাও অনেক বড় সওয়াবের কাজ। এ প্রসঙ্গে এক বর্ণনায় এসেছে, মহানবি সা. বলেছেন, 'রমজান মাসে উমরাহ আদায় আমার সঙ্গে হজ আদায়ের সমতুল্য।' (মাজমাউল কাবির, হাদিস: ৭২২; জামেউল আহাদিস, হাদিস: ১৪৩৭৯)

৭. বেশি বেশি জিকির-আজকার করা:

আমরা তো অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিই অহেতুক কথাবার্তায়। অথচ আমরা চাইলেই পারি ওই সময়গুলোতে তাসবিহ-তাহলিল করে কাটাতে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মুমিনরা, তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকাল-বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো। (সুরা আহযাব, আয়াত: ৪১-৪২)

৮. নিজের সাধ্যমতো অন্যকে সদকা করা:

রমজানের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দান-সাদকাহ করা। কারণ আমাদের প্রিয় নবিজি এই মাসে এ-কাজটি খুব বেশি বেশি করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সা. ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রমজানে তিনি আরও অধিক দানশীল হতেন, যখন জিবরাইল আ. তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমজানের প্রতি রাতেই জিবরাইল আ. তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন এবং তাঁরা একে অন্যকে কুরআন

তিলাওয়াত করে শোনাতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬)

৯. দোয়ার ইহতেমাম করা:

উপরোক্ত কাজগুলোর সাথে সাথে বেশি বেশি দোয়ায় গুরুত্ব দেওয়া। বিশেষ করে ইফতারের সময়।

হাদিসে এসেছে—'অবশ্যই আল্লাহ তাআলা রমজান মাসে প্রতি ইফতারের সময় অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। প্রতি রাতেই তা হয়ে থাকে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১৬৪৩) এই পবিত্র রমজানে পুণ্য কামানোর সহজ উপায় যদি সংক্ষেপে বলি, তাহলে অনেক উপায় রয়েছে। বিশেষ করে সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, নিজে সহিহভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং অন্যকে শেখানো, সময়মতো সাহরি ও ইফতার করা, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া, দরুদ শরিফ পাঠ করা, বেশি বেশি দান-সদকা করা, রোজাদারকে ইফতার করানো। ইতিকাফ করা। এরকম আরও অনেক সৎকাজ রয়েছে, সেগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিকভাবে বোঝার ও আমল করার মাধ্যমে এই মহিমান্বিত রমজান মাসে পরিপূর্ণ পুণ্য কামানোর তাওফিক দান করুন এবং জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার তাওফিক দান করুন, আমিন।

প্রতিকূলতা বা বালা-মসিবত তোমাকে শেখাবে যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া তোমার জন্য অন্য কেউ নেই। যারা ছিলো, তারা সাময়িক। বুঝে নিয়ো তারা স্বার্থান্বেষী, সুযোগসন্ধানী। বিপদে তাদের কখনোই পাবে না। নিজেকে মানিয়ে নিবে। ভেঙ্গে পড়া যাবে না। তবে এই পথে সর্বদা যাদের পাশে পাবে, তাদের আমৃত্যু মুনাজাতে স্মরণ রাখবে। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। মনে রেখো, বিপদাপদ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, তাই সর্বক্ষেত্রে রবের দিকেই ফিরবে। তার কাছেই চাইবে। তিনি তোমার। তিনি রহমান। দেনেওয়ালা। মাফ করনেওয়ালা। দোয়া কবুল করনেওয়ালা। – সম্পাদক

রমজান মাস। কুরআনের মাস। মুমিনের সবচেয়ে প্রিয় মাস। এ মাস সাধনার মাস। এ মাস নিজেকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়ার মাস। গুনাহ থেকে বিরত থাকার মাস। জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। এই মাসকে আল্লাহ তাআলা চয়ন করেছেন। নাজিল করেছেন আল কুরআন। শুধু এই নাম 'রমজান' নিজ কালামে পাকে উল্লেখ করেছেন। এজন্য এই মাসের গুরত্ব ও মাহাত্ম্য একজন মুমিন জীবনে অনেক বেশি। রহমত, বরকত আর মাগফিরাতের বারিধারা নিয়ে হাজির হওয়া এ মাসে বান্দা নিজেকে মশগুল করেন প্রভুর আনুগত্যে। অর্জন করেন রাশি রাশি সাওয়াব। পবিত্র আল কুরআনের আলোকে আমরা এ মাসের বিশেষ ফজিলত ও মাহাত্ম্যের কথা জেনে নেব।

- রমজান মাস। হিজরি বর্ষের মাসগুলোর মধ্যে শুধু এই মাসের নাম কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ মাসেই মহাগ্রন্থ আল কুরআন নবি আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ রমজান মাস, যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। (আল বাকারাহ: ২৮৫)
- এ মাসে রয়েছে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রজনি। লাইলাতুল কদর। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এ মাসকে আরও মহিমান্বিত করেছেন। এ রাতে বান্দার পাপসমূহ ক্ষমা করা হয়। সাওয়াব বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ

الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) নিশ্চয় আমি এটি নাজিল করেছি 'লাইলাকুল ক্বাদরে।' তোমাকে কীসে জানাবে 'লাইলাতুল ক্বাদর' কী? 'লাইলাতুল ক্বাদর' হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাইল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে। শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত। (আল ক্বদ্‌র: ১-৫)

- এ মাসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো সাওম। যার মাধ্যমে বান্দা আত্মসংসম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য ও তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নৈকট্য লাভ ও বিশেষ সাওয়াব হাসিল করে।অতীত যুগের বান্দাদের কাছে রোজাকে আবশ্যক করা হয়েছিল। ফলে আমাদের উপরও তা ফরজ করে হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। (আল বাকারাহ: ২৮৩)
- রমজানের চাঁদ যখন দেখা দেবে, তখন থেকে সাওম পালন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। (আল বাকারাহ: ২৮৫)
- সাওম অর্থ [খাবার, পানাহার ও সহবাস থেকে] বিরত থাকা। আল্লাহ তাআলা এর জন্য সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় সীমাবদ্ধ করেছেন। যেন আমাদের জন্য সহজ হয়। আল্লাহ বলেন, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ আর আহার করো ও পান করো যতক্ষণ না ফজরের সাদা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো। (আল বাকারাহ: ২৮৭)
- অসুস্থ, মুসাফির ও সাওম পালনে অক্ষম ব্যক্তির ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশনা হলো, অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ও মুসাফির ব্যক্তি সফর শেষ করে রোজা রাখতে পারবে। আর যে ব্যক্তি রোজা রাখতে অক্ষম সে রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া তথা একজন মিসকিনকে খাবার প্রদান করবে। আল্লাহ বলেন, أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফওে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। (আল বাকারাহ: ২৮৪)

  আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদেও সহজ চান এবং কঠিন চান না। (আল বাকারাহ: ২৮৫)

অক্ষম ব্যক্তিদের ব্যাপারে বলেন, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানো। (আল বাকারাহঃ ২৮৪)

রমজানের রোজা শুধু আবশ্যকীয় ইবাদতই নয়; বরং তা আত্মিক উন্নতি ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যম। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ-আক্রোশ ও কাম-চাহিদা থেকে মানুষকে দূরে রাখে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা লাভের আশায় রোজাদার ইন্দ্রিয় স্বাদ-তৃপ্তি থেকে বিরত থেকে তাকওয়া অর্জন করে। ফলে মন ও মনন পবিত্র হয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে। অর্জন হয় আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা।

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের পবিত্র রমজান মাসের ফজিলত জেনে বেশি বেশি আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক, মুফতী ওলিউল্লাহ তাহসীন

গবেষক ও লেখক

হাদিসের আলোকে মাহে রমজান

হিজরি সনের সেরা মাস রমজান। ধর্মীয়ভাবে এ মাসের গুরুত্ব অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেক বেশি। গুরুত্বপূর্ণ এ মাসে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য রেখেছেন অফুরন্ত নিয়ামত। এ মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত রোজা। রোজা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় ইবাদত। রমজানের রোজা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমান, হাদিস শরিফে বর্ণিত রোজার কিছু ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো:

১. রোজার বিনিময় আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন নিজেই দেবেন এবং বিনা হিসাবে দেবেন

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: আল্লাহ রাববুল আলামিন বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে, রোজা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দেবো আর (অন্যান্য) নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার দশগুণ। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ, হাদিস: ৯৯৯৯)

রোজার এত বড় ফজিলতের কারণ এটাও হতে পারে যে, রোজা ধৈর্যের ফলস্বরূপ। আর ধৈর্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দেন: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ধৈর্যধারণকারীগণই অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে। (সুরা যুমার: ৩৯)

২.আল্লাহ তাআলা রোজাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন

হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, রোজা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো। কেয়ামতের দিন রোজাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোজাদার ব্যতীত অন্য কারও আগমন ঘটবে না। (মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদিস: ৫০৯৩)

৩. রোজা হলো জান্নাত লাভের পথ

হজরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকের সাথে মিলিয়ে নিলাম, তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোজা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির

উদ্দেশ্যে কোনো দান-সদকা করে তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস: ২৩৩২৪)

৪. রোজাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে

হজরত সাহল ইবনে সাদ রা. হতে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোজাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে—কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোজাদারগণ? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোজাদারগণ যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৮৯৬;)

৫. রোজা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—রোজা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে রব, আমি তাকে খাদ্য ও প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানো থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস: ৬৬২৬)

৬. রোজা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ

উসমান ইবনে আবিল আস রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: রোজা হলো জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের (শত্রুর আঘাত হতে রক্ষাকারী) ঢালের মতো। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস: ১৬২৭৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১৬৩৯)

৭. রোজার বদলে রোজাদারের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়

হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজান মাসের রোজা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৮, ২০14; সহিহ মুসলিম: ৭৬০/১৬৫)

৮. রোজাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সেই সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর

নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৯০৪)

৯. রোজাদারের জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত

হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে, যখন সে আনন্দিত হবে। **এক.** যখন সে ইফতার করে, তখন ইফতারের কারণে আনন্দ পায়। **দুই.** যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে, তখন তার রোজার কারণে আনন্দিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, আর তিনি তাকে পুরস্কার দেবেন, তখন সে আনন্দিত হবে। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৯০৪, ১৮৯৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১১৫১/১৬৩, ১৬৪, ১৬৫; মুসনাদে আহমদ, হাদিস: ৯৪২৯, ৭১৭৪; সুনানে তিরমিযি, হাদিস: ৭৬৬)

১০. রোজা মানবীয় রোগ তথা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়

হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সবরের মাসের (রমজান মাস) রোজা এবং প্রতি মাসের তিন দিনের (আইয়্যামে বীয) রোজা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস: ২৩০৭০; সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস: ৬৫২৩)

১১. রোজা আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

হজরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন। তিনি বললেন, তুমি রোজা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে কোনো নেক আমলের কথা বলুন, তিনি বললেন, তুমি রোজা রাখ, কেননা এর কোনো সমতুল্য কিছু নেই। (সহিহ ইবনে খুযাইমা, হাদিস: ১৮৯৩; মুসনাদে আহমদ, হাদিস: ২২১৪০; সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস: ৩৪২৫; সুনানে নাসায়ি কুবরা, হাদিস: ২৫৩৩)

রমজান হলো খালেস ইবাদতের মৌসুম। তাই এ মাসের সময়গুলো যতটা আল্লাহর সাথে কাটানো যায়, ততই ভালো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হাদিস অনুযায়ী আমল করার ও উক্ত ফজিলত লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমিন। ইয়া রাব্বাল আলামিন।

লেখক, মুফতী ফারুক হানযালা
মুহাদ্দিস ও গবেষক

রমজানের ফজিলত ও আমাদের করণীয়

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী দা. বা.

পবিত্র রমজান মাসের প্রারম্ভকালে রমজানের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সুদীর্ঘ এক বক্তব্যে মহানবি সা. বলেন, ‘হে লোকজন, তোমাদের কাছে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র মাস আগমন করেছে। এ মাসে একটি রাত আছে, তা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ মাসের দিনে আল্লাহ তাআলা রোজা ফরজ করেছেন এবং রাতে নফল নামাজ দিয়েছেন। এ মাসে যে কোনো নফল কাজ করবে, সে অন্য মাসের ফরজ সমতুল্য এবং এ মাসের প্রতিটি ফরজ কাজে অন্য মাসের সত্তর গুণ ফরজ সমতুল্য বিনিময় লাভ করবে।

এ মাস ধৈর্য ও সহনশীলতার মাস। আর ধৈর্যের প্রতিফল হলো বেহেশত। এ মাস পরস্পর সাহায্য ও সহনশীলতার মাস। এ মাসে আল্লাহ মুমিন বান্দাদের রিজিক বৃদ্ধি করে দেন। এ মাসে যে একজন রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার সব গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। পরকালে তাকে আগুন থেকে মুক্তি দান করবেন এবং তাকে রোজাদারের সমতুল্য বিনিময় দান করবেন। এবং ওই রোজাদারের বিনিময়ে কোনো কমতি হবে না।’

সাহাবাগণ বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সা. আমাদের সবাই ইফতার করানোর মতো সক্ষমতা রাখে না। উত্তরে মহানবি সা. বলেন, ‘যে একজন

রোজাদারকে একটি খেজুর, সামান্য পানি অথবা অল্প দুধের মাধ্যমে ইফতার করাবে, আল্লাহ তাআলা তাকেও এ মহা বিনিময় দান করবেন। এ মাসের প্রথম অংশ রহমত, মধ্যের অংশ ক্ষমা এবং শেষ অংশ আগুন থেকে মুক্তির জন্য বরাদ্দ। এ মাসে যারা কর্মচারীদের কাজ হালকা করে দেবে, আল্লাহ তার পাপ মুছে দেবেন

এবং দোজখ থেকে তাকে মুক্তি দান করবেন। অতএব, তোমরা চারটি কাজ বেশি বেশি করো। দুটি কাজের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায়।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই) এ সাক্ষ্য প্রদান করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর দুটি কাজ এমন, যা ব্যতীত তোমাদের কোনো উপায় নেই। তা হলো আল্লাহর বেহেশত চাওয়া এবং দোজখ থেকে মুক্তি চাওয়া। যে ব্যক্তি একজন রোজাদারকে পান করাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে আমার হাউজে কাউসার থেকে পান করাবেন, ফলে বেহেশতে প্রবেশ করা পর্যন্ত আর কখনো পিপাসা হবে না।' (সহিহ ইবনে হিব্বান)
আজ গোটা দেশ বিভিন্ন সমস্যায় নিমজ্জিত। সমগ্র জাতি দিশাহারা। এ মুহূর্তে ক্ষমা ও মুক্তির মাস পবিত্র রমজান আসন্ন। আমরা সব ধরনের অন্যায়, পাপাচার ও দুর্নীতি ছেড়ে মহান প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। প্রত্যেকেই নিজেকে আদর্শ মানব হিসেবে গড়ার দীপ্ত শপথ নিই। মহানবি সা.-এর উল্লিখিত বাণীর প্রতিটি বাক্য নিজের জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করি।
হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রহ. বলেন, রোজা পালনের মধ্যে আমাদের ভাবনার মতো একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। রমজান মাসে আমরা আল্লাহর ভয়ে হালাল খাদ্য সাময়িকভাবে বর্জন করি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হিংসা, পরনিন্দা, অপবাদ প্রবণতা ও পাপাচারও বর্জন করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। সাহাবি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'যে মিথ্যা বলা এবং অপকর্ম ও পাপাচার বর্জন করেনি, তার পানাহার বর্জন আল্লাহর কাছে কোনো প্রয়োজন নেই।' (সহিহ বুখারি)
মহান প্রভু বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পারো। (সুরা আল বাকারাহ-১৮৩)
অতএব, আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও কাজকর্মে খোদাভীতি অর্জন করাই রোজা পালনের যথার্থ মূল্যায়ন হবে। হবে সিয়াম সাধনার বাস্তব সফলতা। তাই আমরা যথাযথভাবে রমজানের সিয়াম সাধনার শপথ গ্রহণ করি।

লেখক : গবেষক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকা

ইবাদতের বসন্তকাল মাহে রমজান

● মুফতি আইয়ুব নাদীম

ইসলাম যে পাঁচ স্তম্ভের ওপর যুগ-যুগ ধরে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে, তার অন্যতম একটি রমজান মাসের রোজা। হিজরি সনের নবম মাস রমজান। ঈমান, নামাজ ও জাকাতের পরই রোজার স্থান। রমজান মাস হলো মোমিনের জন্য ইবাদতের বসন্তকাল। বসন্তকালে যেভাবে গাছগাছালি বাহারি পাতায় সেজেগুজে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আর পশুপাখি ইচ্ছামতো খেয়ে-দেয়ে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে। তেমনই মুমিন বান্দা-বান্দি এই মাসে ইবাদত-বন্দেগি করে আত্মিক উন্নতি করতে পারে, রবের অধিক সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। আর বছরের অন্যান্য মাসে যেসব ইবাদত পালন করা যায় না; তা এই মাসে পালন করে সওয়াবের পাল্লা ভারী করা যায়। তাছাড়া অন্যান্য মাসে যে ইবাদত-বন্দেগি করে এক গুণ সওয়াব পাওয়া যায়, রমজান মাসে ওই ইবাদত করে সত্তর গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। রোজার গুরুত্ব ও নানা ফজিলতের কথা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আমরা এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনা তুলে ধরব।

রোজার পরিচয়: রোজার আরবি শব্দ সওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় সওম বলা হয়, প্রত্যেক সজ্ঞান, বালেগ, মুসলমান, নর-নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজার নিয়তে যাবতীয় পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোজা ভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রমজান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকিম, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েজ-নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর ওপর পূর্ণ রমজানের রোজা রাখা ফরজ।

রোজায় তাকওয়া অর্জন হয়: প্রতিটি আমলের একটি প্রভাব আছে, রোজার প্রভাব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।' (সুরা বাকারা: ১৮৩)

রোজার প্রতিদান আল্লাহ তাআলা নিজে প্রদান করেন: হজরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'বনি আদমের প্রতিটি আমলের প্রতিদান

বহুগুণে বৃদ্ধি হতে থাকে, ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ, এমনকি আল্লাহ চাইলে তার চেয়েও বেশি দেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ যার জন্য চান আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ ব্যাপকদাতা ও সর্বজ্ঞ।' (সুরা বাকারাঃ ২৬১) তবে রোজার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা রোজা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং এর প্রতিদান দেবো। বান্দা একমাত্র আমার জন্য পানাহার ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ থেকে বিরত থাকে। রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ। এক. ইফতারের মুহূর্তে। দুই. রবের সঙ্গে সাক্ষাতের মুহূর্তে। আর রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের চেয়েও উত্তম।' (সহিহ মুসলিমঃ ১১৫১)

রোজাদারের জন্য ক্ষমার পুরস্কারঃ

হজরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।' (সহিহ বুখারিঃ ১৯০১)

রোজাদারের সম্মানে জান্নাতে বিশেষ দরজাঃ

হজরত সাহল ইবনে সাদ রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'জান্নাতে রাইয়ান নামে একটি দরজা আছে। এই দরজা দিয়ে শুধু রোজাদাররা প্রবেশ করবে। ঘোষণা করা হবে, রোজাদাররা কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। যখন তাঁরা প্রবেশ করবে, তখন ওই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং সেই দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না।' (সহিহ বুখারিঃ ১৮৯৬)

রোজাদারের দোয়া কবুল হয়ঃ

হজরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না; রোজাদারের দোয়া ইফতার করা পর্যন্ত। ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ দোয়া। মাজলুমের দোয়া।

আল্লাহ তাআলা তাদের দোয়া মেঘমালার উপরে উঠিয়ে নেন। এর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। আর আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার ইজ্জতের কসম! বিলম্বে হলেও আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব।' (সুনানে তিরমিযিঃ ৩৫৯৮)

রমজান ইবাদতের মাসঃ

হজরত আনাস ইবনে মালিক রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমজান মাস এলে রাসুলুল্লাহ সা. বলতেন, রমজান মাস তোমাদের মাঝে উপস্থিত। এ মাসে রয়েছে এমন এক রাত, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের (কল্যাণ হতে) বঞ্চিত রয়েছে; সে এর সকল কল্যাণ হতেই বঞ্চিত। শুধু হতভাগ্যরাই এ রাতের কল্যাণ লাভ হতে বঞ্চিত থাকে। (ইবনে মাজাহঃ ১৬৪৪) বোঝা গেল, এই মাসের এক রাতের ইবাদত সহস্র মাস ইবাদত করা

থেকে উত্তম। যে বান্দা এই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়, সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।

রোজাদারের সুপারিশ কবুল হয়:

হজরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন রোজা ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে আমার প্রতিপালক, আমি ওকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। আর কুরআন বলবে, আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতএব ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।' (মুসনাদে আহমাদ: ৬৬২৬)

রোজা অতুলনীয় ও রিয়ামুক্ত ইবাদত:

হজরত আবু উমামা রা. বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে বললাম, আপনি আমাকে এমন কিছু নির্দেশ দিন, যা আমি পালন করতে পারব, রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি রোজা আঁকড়ে ধরো, কারণ এর সমতুল্য কোনো ইবাদত নেই।' (সুনানে নাসায়ি: ২২২০)

রোজায় যৌনক্ষমতা দমন হয়:

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সা.-এর সাথেই ছিলাম, তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে, কারণ বিবাহ দৃষ্টি অবনত রাখে, আর লজ্জাস্থানের হেফাজত হয়। আর যে ব্যক্তি বিবাহের সমর্থ্য রাখে না; সে যেন রোজা রাখে, কারণ রোজায় যৌনক্ষমতা দমন হয়।' (সহিহ বুখারি: ১৯০৫)

রোজা শরীরের জাকাতস্বরূপ:

হজরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'প্রতিটি বস্তুর জাকাত আছে, আর শরীরের জাকাত রোজা রাখা।' (ইবনে মাজাহ: ১৭৪৫)

রোজায় সুস্থতা লাভ হয়:

হজরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তোমরা রোজা রাখো সুস্থ থাক'। (আল-মুজামুল আউসাত: ৪২০)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইবাদতের বসন্তকাল মাহে রমজানকে ইবাদত-বন্দেগির মধ্য দিয়ে যথাযথভাবে কাটানোর তাওফিক দান করুন। আমিন

মুহাদ্দিস, জামিয়া কাশেফুল উলূম (হাটখোলা মাদ্রাসা) মধুপুর, টাঙ্গাইল

নবি সা. : ন্যায়পরায়ণতার অনন্য প্রতীক যিনি

● **আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফী**

ন্যায়পরায়ণতা। আরবিতে বলে আদল বা ইনসাফ। মানবীয় চারিত্রিক গুনাবলির মাঝে শ্রেষ্ঠতম একটি গুণ। ন্যায়পরায়ণতার ছোঁয়াহীন সমাজ যেন ধু ধু মরুপ্রান্তর। যেখানে মানবতা ভূলুণ্ঠিত। বিচারের বাণী যেখানে নিভৃতে কেঁদে মরে। পক্ষান্তরে ন্যায়পরায়ণতার সৌরভে সুরভিত সমাজ যেন মাটির পৃথিবীতে জান্নাতের এক অনিন্দ্য সুন্দর ঝলকানি। যেন মাঘের শীতের এক টুকরো ওমবহুল রোদ্দুর।

সুন্দর সুসম উন্নত সমাজ গড়তে সমাজের প্রতিটি মানুষের চেতনাজুড়ে ন্যায়পরায়ণতার সৌরভ ধারণের বিকল্প নেই। মানবজাতির সফলতার একমাত্র ঠিকানা ইসলামে ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা তাই সর্বাগ্রে। কুরআন মাজিদে সুদৃঢ়ভাবে স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ হয়েছে—

'নিশ্চয়ই আল্লাহ আদল করার (ন্যায়পরায়ণতা) হুকুম দেন।' (সুরা নাহল: ৯০)

ইসলামে ন্যায়পরায়ণতার গুরুত্ব এত বেশি যে, ইসলাম শত্রুদের অপছন্দনীয় কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও তাদের সাথে ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—'কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে আদল (ন্যায়পরায়ণতা) পরিত্যাগে প্ররোচিত

না করে। ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করো। এ পন্থাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। (সুরা মায়িদা: ৮)

ন্যায়পরায়ণতা সকল বিষয়ের যথাযথ মূল্য প্রদান করে। ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমেই মানুষের যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যে জাতির মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সৌরভ আছে, তাঁরা সৌভাগ্যবান এবং উন্নতির সর্বোচ্চ চূড়ায় উন্নীত। পক্ষান্তরে ন্যায়পরায়ণতার সৌরভ থেকে বঞ্চিত জাতি নিঃসন্দেহে দুর্ভাগা এবং নিচুতার তকমা ধারণকারী।

মানবজাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারীদের ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দিয়েছেন, ন্যায়পরায়ণতার সৌরভে সুরভিত জীবন গড়তে উৎসাহিত করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— সুবিচারক লোক আল্লাহ তাআলার নিকট তার ডান হাতের দিকে নূরের মিম্বরের উপর উপবিষ্ট থাকবেন। যারা তাদের বিচারকার্যে, পরিবারে ও দায়িত্বভুক্ত বিষয়ে ইনসাফ রক্ষা করে। রাবি মুহাম্মদ রহ. তাঁর হাদিসে বলেন, আল্লাহর উভয় হাতই ডান হাত। (সুনানে নাসায়ি: ৫৩৭৯)

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে ন্যায়পরায়ণতার বীজ বপন করেছেন। তাছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্যুতিময় পবিত্র জীবনের পুরোটাই ন্যায়পরায়ণতার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। নবুওতপ্রাপ্তির আগেই তিনি অত্যাচারিতের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার বিমল চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের বাড়িতে কুরাইশের চিন্তাশীল যুবকদের সমন্বয়ে 'হিলফুল ফুজুল' নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

কাবা পুনঃনির্মাণের সময় 'হাজরে আসওয়াদ' স্থাপন নিয়ে কুরাইশদের মাঝে সৃষ্ট সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসনে সর্বসম্মতিক্রমে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার উপর আস্থা রাখা হয়েছিল।

নবুওতপ্রাপ্তির পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের চেতনাজুড়ে ন্যায়পরায়ণতার সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছেন সুদৃঢ়ভাবে। নবি-

জীবনের ন্যায়পরায়ণতার বিমল সৌরভজড়ানো একটি ঘটনা, যা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীবাসীর সামনে ন্যায়পরায়ণতার অনন্য স্মারক হয়ে আছে। ঘটনাটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, মাখযুমি গোত্রের এক মহিলার ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল যে চুরি করেছিল। সাহাবাগণ বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে? আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রিয় জন উসামাহ রা. ছাড়া এটা কেউ করতে পারবে না। তখন উসামাহ রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে কথা বললেন। এতে তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর শাস্তির বিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিলেন এবং বললেন, হে মানবমন্ডলী, নিশ্চয়ই তোমাদের আগের লোকেরা গুমরাহ হয়ে গিয়েছে। কারণ, কোনো সম্মানী ব্যক্তি যখন চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোনো দুর্বল লোক চুরি করতো, তখন তার উপর শরিয়তের শাস্তি কায়েম করতো। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে, তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত কেটে দেবে। (সহিহ বুখারি, হাদিসঃ ৬৭৮৮)

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় সতর্ক থাকতেন, যেন মানুষের প্রতি কোনো অন্যায় বা অবিচার না হয়ে যায়।

সুওয়াইদ ইবনু কায়িস রা. থেকে বর্ণিত, আমি এবং মাখরাফাহ আল-'আবদি হাজার' নামক স্থান থেকে ব্যবসায়ের জন্য কাপড় কিনে আনি। অতঃপর আমরা তা মক্কায় নিয়ে আসি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেঁটে আমাদের কাছে আসলেন। তিনি আমাদের সাথে একটি পাজামার দর করলেন, আমরা সেটি তাঁর কাছে বিক্রি করলাম। এ সময় এক ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে (জিনিসপত্র) ওজন করে দিচ্ছিল। তিনি তাকে বলেন, ওজন করো এবং একটু বেশি দাও।

(সুনানে আবু দাউদঃ ৩৩৩৬)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দীর্ঘ জীবনে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতাকে প্রতিষ্ঠা করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছেন। নিজের মাঝেও শতভাগ ন্যায়পরায়ণতার সৌরভ ধারণ করেছেন সুদৃঢ়ভাবে। সিরাতের পাতায় পাতায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়পরায়ণতার

গল্পগুলো ছড়ানো আছে মণি-মুক্তার মতো। যেগুলো পাঠকালে একজন পাঠক আলোড়িত হন, শিহরিত হন দারুণভাবে। একবার মুনাফিক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়পরায়ণতায় কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করেছিল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দৃঢ়তা ও প্রতাপের সাথে সেই কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

জাবির বিন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিরানাহ নামক স্থানে গনিমাতের মাল ও সোনারূপা বণ্টন করছিলেন। এগুলো বিলাল রা.-এর কোলে ছিল। এক ব্যক্তি বলল, হে মুহাম্মাদ, ইনসাফ করুন। কেননা, আপনি ইনসাফ করছেন না। তিনি বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়, আমিই যদি ইনসাফ না করি, তবে আমার পরে কে ইনসাফ করবে? উমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এই মুনাফিকের ঘাড় উড়িয়ে দিই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দলের উদ্ভব হবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা এমনভাবে ধর্মচ্যুত হবে, যেমন ধনুক থেকে তির শিকারের দিকে দ্রুত ছুটে যায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১৭২)

অমুসলিমদের প্রতিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়পরায়ণতার হাত প্রসারিত ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— 'কোনো ব্যক্তি যদি কোনো অমুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করে, তাহলে সে আল্লাহর নিকট এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার উপর অত্যাধিক রাগান্বিত থাকবেন।'

জুলুমে জুলুমে পৃথিবীটা আজ বিধ্বস্ত। জাহান্নামের আগুনে যেন ঝলসে যাচ্ছে সবকিছু। এর মৌলিক কারণ ন্যায়পরায়ণতার সুপ্রকট অনুপস্থিতি। পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজাতে ন্যায়পরায়ণতার অনন্য প্রতীক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিমল আদর্শের যথার্থ বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া গাফুরিয়া মাখযানুল উলুম টঙ্গী, গাজীপুর।

কুরআন মানবজাতির জন্য অভ্রান্ত পথনির্দেশনা

• **আলী ওসমান শেফায়েত**

আমরা যদি আত্মসমালোচনাপূর্বক নিজদের প্রশ্ন করি, প্রকৃত অর্থেই আমাদের মূল্যবোধ, শিষ্টাচার-সৌজন্য, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা ও আদর্শিক দিক দিয়ে সজাগ-সচেতনভাবে আসন্ন পবিত্র রমজান মাসকে রহমত, বরকত ও মাগফিরাত অর্জনের লক্ষ্যে আমরা কি স্বাগত জানিয়েছি?

কার্যত এ মাসকে আমরা স্বাগত জানাইনি। যদি জানাতে পারতাম, তাহলে এ মাসের আদর্শিক পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবজীবনে কিছুটা হলেও পরিবর্তন হতো। পবিত্র এ মাস আগমনের আগে প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে আমরা অনাকাঙ্ক্ষিত যেসব খবর পাঠ করি এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় দেখি। এ মাসে তার কোনো ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না; বরং অপরাধ-জগৎ মুখব্যাদান করে সমগ্র জাতিকে গ্রাস করতে উদ্যত। এর অর্থ হচ্ছে, রমজান মাসকে আমরা কেবল মৌখিকভাবে স্বাগত জানিয়েছি, কিন্তু এর আদর্শকে আন্তরিকভাবে ধারণ করিনি। যদি প্রশ্ন ওঠে, এ মাসকে আমরা কীভাবে স্বাগত জানাবো? জবাবে বলা যেতে পারে, এ মাসকে স্বাগত জানাতে হবে আমাদের কর্ম ও জীবনাচরণের মাধ্যমে, শুধু মৌখিকভাবে নয়।

বছরের ১২টি মাসের মধ্যে রমজান মাসকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে

এ জন্য যে, এ মাসেই মহান আল্লাহ স্থায়ীভাবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য পরিপূর্ণ জীবনদর্শন ও জীবনবিধান আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এ কিতাব সম্মান-মর্যাদার ও জিন সম্প্রদায় একতাবদ্ধ হয়ে চেষ্টা-সাধনা করলেও আল কুরআনের ক্ষুদ্রতম একটি আয়াতের অনুরূপ আয়াতও রচনায় সক্ষম হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর আমি আমার বান্দার ওপর যা নাজিল করেছি, যদি তোমাদের সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে, তবে তোমরা তার মতো একটি সুরা (বানিয়ে) আনো।" (সুরা বাকারাহ, আয়াত: ৩)

রমজান মাসকে আমরা কীভাবে স্বাগত জানাবো, বাস্তবতা হলো তা আমরা জানি না। যিনি মর্যাদাসম্পন্ন এ মাস দান করেছেন তিনিই এর গুরুত্ব, মর্যাদা এবং এ মাসকে কীভাবে স্বাগত জানাতে হবে, তা জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন— "রমজান মাস, যাতে নাজিল করা হয়েছে আল কুরআন। মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট দলিল ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে।" (সুরা বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫)

কুরআন কেন নাজিল করা হয়েছে? যদি এ প্রশ্ন ওঠে, তাহলে অধ্যয়নকারী দেখতে পাবে—ওই আয়াতের পরবর্তী দিক থেকে অতুলনীয়। এর প্রত্যেকটি শব্দ মহান আল্লাহর বাণী, যার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ ও বক্রতার সামান্যতম অবকাশ নেই। পৃথিবীর প্রলয় দিন পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতি

অংশেই কুরআন নাজিলকারী স্বয়ং আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, "কুরআন মানবজাতির জন্য এটি অভ্রান্ত পথনির্দেশনা এবং পথনির্দেশনার সুস্পষ্ট দলিল ও এমন একটি সংবিধান, যা সত্য-মিথ্যা এবং কল্যাণ-অকল্যাণের পার্থক্য নির্ণয়কারী।" (সুরা বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫)

এ কুরআন মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক, পথনির্দেশনা তথা গাইডবুক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য এটি পথনির্দেশক। আল কুরআন যে পথনির্দেশনা দান করে, তা স্থান-কালের সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ নয়। মহাকালের বিশেষ কোনো অধ্যায়ের জন্য এটি প্রযোজ্য নয়। এটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বকালের সর্বযুগের সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য। কেননা এ কিতাবের আবেদন চিরন্তন, যা কখনোই পুরনো বা জীর্ণ হবে না, এর বিস্ময়কারিতার ইতি কখনোই ঘটবে না। কুরআন হচ্ছে অভ্রান্ত পথের দিকনির্দেশনার মশাল এবং এ কিতাব জ্ঞান-বিজ্ঞানের কূলকিনারাহীন অগাধ এক জলধি।

আল কুরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার শাখা-প্রশাখার অফুরন্ত তত্ত্ব ও অনায়ত্ত

(অনাবিষ্কৃত) অসংখ্য দিক-দিগন্ত বিদ্যমান। মানবীয় অনুসন্ধিৎসা অফুরন্ত এই জ্ঞানসমুদ্র থেকে নিত্যনতুন তত্ত্ব উদ্ধারে সক্ষম। আর প্রতিটি অনুসন্ধানেই প্রত্যেক যুগের সূক্ষ্ম চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ মানবজীবনের জন্য যুগোপযোগী আইনবিধান ও তত্ত্ব উদ্ধারে সক্ষম হবে, যদি তারা প্রতিটি পর্যায়ে অভ্রান্ত পথে দৃঢ় থাকে।

তিরমিজি হাদিস গ্রন্থের ২৯০৬ নম্বর হাদিসটির সারমর্মানুযায়ী—"এ কুরআন দিয়ে যে ব্যক্তি কথা বলবে, সে সত্য কথা বলবে। যে এ কিতাবের দিকনির্দেশনা অনুসারে কর্ম সম্পাদন করবে, সে উভয় জগতে প্রতিদান লাভ করবে। যে এর সাহায্যে বিচার-মীমাংসা করবে, সে ন্যায়বিচার করবে। যে এ কিতাবের প্রতি আহ্বান জানাবে, সে সহজ-সরল পথের দিকে আহ্বান জানাবে। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব অপরিবর্তিত থাকবে, এর ক্ষুদ্রতম একটি অংশেও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটবে না।" (মিশকাত: ২১৩৮, হাদিসটির মান সনদের বিচারে দূর্বল বলেছেন মুহাদ্দিসগণ।)

যদি প্রশ্ন ওঠে, কুরআন মানবজাতিকে কোন কোন বিষয়ে পথনির্দেশনা দেয়? এর জবাব হলো, এ কিতাব মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনের যাবতীয় দিক-বিভাগ পর্যন্ত সব কর্ম সম্পাদনে অভ্রান্ত পথনির্দেশনা দান করে। মানুষের সর্বপ্রকার চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত, মূল্যবোধ, পারস্পরিক সম্পর্ক, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-সন্ধি, বিয়ে-তালাক, সম্পদ বণ্টন, উত্তরাধিকার নির্ধারণ, বন্ধুত্ব-শত্রুতা, গবেষণা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, বস্তুর ব্যবহার তথা মানবজীবনের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন, তার সব দিকেই কুরআন পথনির্দেশনা দান করে।

মানবজাতির প্রয়োজনীয় এমন কোনো বিষয় নেই, যা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়নি। প্রত্যেক বিষয় ও বস্তুর বর্ণনা রয়েছে কুরআনে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর আমি তোমার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বিষয়ের বর্ণনা সংবলিত।" (সুরা নাহল, আয়াত: ৮৯)

"আমি কিতাবে (সব কিছু বর্ণনায়) কোনো ত্রুটি করিনি।" (সুরা আনয়াম, আয়াত: ৩৮)

সুতরাং যে আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁরই পক্ষ থেকে এ কুরআন মানবমণ্ডলীর জন্য অভ্রান্ত পথনির্দেশনা। এ জন্যই রমজান মাসের মূল পয়গাম হলো—

১. কুরআন শিক্ষা

২. কুরআন তিলাওয়াত করা

৩. কুরআন অর্থসহ বুঝে পড়া তথা অধ্যয়ন করা

৪. কুরআন নিয়ে গবেষণা করা

৫. কুরআনের দিকনির্দেশনা বাস্তবজীবনে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা
৬. কুরআনের শিক্ষা তথা দিকনির্দেশনা জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে বিস্তারের জন্য বাস্তবভিত্তিক কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা।

১. কুরআন শিক্ষা:

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকেও শিক্ষা দেয়।" (সহিহ বুখারি: ৫০২৭, ৫০২৮) উপরোল্লিখিত হাদিসের মাধ্যমে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, সবার জন্য কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. কুরআন তিলাওয়াত করা:

তিলাওয়াত খণ্ডকালীন নয়, কর্মব্যস্ততার মাঝে ক্ষণকাল অবসর পেলে কুরআনের দু-একটি আয়াত প্রতিদিনই সকাল-সন্ধ্যা তিলাওয়াত করতে হবে। বাসাবাড়ি, অফিস-আদালত, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সর্বত্র প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না।" (আবু দাউদ: ২০৪২; তিরমিজি: ২৮৭৭; মিশকাত: ৯২৬, ২১১৯)
উল্লেখ্য, আজকাল যারা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন তাদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন খুবই সহজ।

৩. কুরআন অর্থসহ বুঝে পড়া তথা অধ্যয়ন করা:

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন বুঝিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। "অতঃপর তার বর্ণনার (কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের) দায়িত্ব আমারই।" (সুরা কিয়ামাহ, আয়াত: ১৯)
সাহাবায়ে কেরাম আরবিভাষী হলেও তাদের সবার পক্ষে কুরআন অনুধাবন সম্ভব ছিল না। অধ্যয়নকালে যখনই তারা উপলব্ধিকরণে জটিলতা অনুভব করতেন, তখনই তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে জেনে নিতেন। তাঁর অবর্তমানে লোকজন কুরআন-অভিজ্ঞ সাহাবায়ে কেরামের সাহায্য গ্রহণ করতেন। আমাদেরও কুরআন অনুধাবনে জটিলতা অনুভুত হলে শিরক-বিদআতমুক্ত হক্কানি উলামায়ে কেরামের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। স্বয়ং কুরআনে তাগিদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা না জানো। (সুরা নাহল, আয়াত: ৪৩)
অপর আয়াতে বলা হয়েছে, "যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?" (সুরা যুমার, আয়াত: ৯)

৪. কুরআন নিয়ে গবেষণা করা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে?" (সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৪)

কুরআন নিয়ে গবেষণা মুসলিম গবেষকদের আবশ্যিক দায়িত্ব। এতে আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও পৃথিবীর বস্তুনিচয়? সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব সূত্র উল্লেখ রয়েছে, তা দ্বারা মানবজাতিকে প্রগতির শীর্ষে পৌঁছে দিতে হবে। এ কুরআনকে অনুধাবনপূর্বক শিক্ষা গ্রহণ করা জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ তাআলা সহজ করেছেন, "আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব, কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?" (সুরা ক্বামার, আয়াত: ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

৫. কুরআনের দিকনির্দেশনা বাস্তবজীবনে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা: এর অর্থ হচ্ছে কুরআনের ওপর আমল করতে হবে। এ কিতাব যা আদেশ দিয়েছে তা কথা ও কর্ম দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হবে। আর যা নিষেধ করেছে বা কথা-কর্ম থেকে বিরত থাকতে বলেছে, তা থেকে বিরত থাকতে হবে। পার্থিবজীবন পরিক্রমায় মহান আল্লাহ যে সীমা নির্ধারণ করেছেন, তা অতিক্রম করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, "এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যে আল্লাহর সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই জালিম।" (সুরা বাকারাহ, আয়াত: ২২৯)

৬. কুরআনের শিক্ষা তথা দিকনির্দেশনা জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে বিস্তারের জন্য বাস্তবভিত্তিক কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা: এটি মুসলিম উম্মাহর আবশ্যিক দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হও এবং রাসুল সাক্ষী হয় তোমাদের ওপর।" (সুরা বাকারাহ, আয়াত: ১৪৩)

প্রত্যেক মুসলিমকে চলমান কুরআনে পরিণত হতে হবে, তার সামগ্রিক আচার-আচরণ, ব্যবহার, কথা-কর্ম সবকিছুর মধ্য দিয়ে কুরআনের শিক্ষা বাস্তবে পরিস্ফুটিত হবে। প্রথম দর্শনে তাকে দেখলেই দর্শকের কাছে যেন অনুভূত হয়, "মানুষটি আল কুআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।" কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির সম্মুখে আল কুরআন ওই আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে 'উম্মতে ওয়াসাতা' বিশেষণে ভূষিত করেছে। 'উম্মতে ওয়াসাতা' শব্দদ্বয় দ্বারা প্রকৃত অর্থে ওই মুসলিম উম্মাহকে বোঝায়, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল কুরআনের আলোকে যে মুসলিম উম্মাহ গড়েছিলেন। তারা পৃথিবীর যে ভূখণ্ডেই পদার্পণ করেছেন, সেই ভূখণ্ডের অধিবাসীগণ অবাক বিস্ময়ে 'সর্বাঙ্গীণ সুন্দর সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রবিশিষ্ট ন্যায়পরায়ণতার জীবন্ত ছবি' দেখেছে। উম্মতে ওয়াসাতা হচ্ছে সেই জনগোষ্ঠী, যাদের সার্বিক জীবনধারা প্রমাণ করবে যে, কেবল এই মানুষগুলোর মাধ্যমেই সমগ্র পৃথিবীতে

কল্যাণকর সমীরণ প্রবাহিত হবে, শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানবতা ইনসাফ পাবে এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত হবে।

এরা কথা ও বাস্তব কর্মের দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর বাস্তবতা মানবজাতির সম্মুখে তুলে ধরবে। মহান আল্লাহ মানবজাতির জন্য যে জীবনাদর্শ পছন্দ ও মনোনীত করেছেন, সে আদর্শের সার্বিক সৌন্দর্য প্রতিভাত হবে মুসলিমদের সামগ্রিক জীবনধারায়। এর অর্থ হলো, মুসলিমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির কাছে বাস্তব সাক্ষী হবে, আল্লাহর মনোনীত জীবনাদর্শই মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। মুসলিমগণ যদি এ সাক্ষী দেয়, তাহলে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও আদালতে আখেরাতে সাক্ষ্য দেবেন, তিনি যে দায়িত্ব তাঁর উম্মাতের ওপর অর্পণ করেছিলেন, তারা তা যথার্থই পালন করেছে।

উপরিউক্ত ছয়টি কাজ করতে পারলে রমজান মাস এবং এ মাসে অবতীর্ণ কুরআনের প্রতি প্রকৃত অর্থে সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শন করা হলো। একই সাথে কুরআনের যে দাবি আমাদের প্রতি, তার হকও আমরা আদায়ে চেষ্টিত হয়েছিলাম। আর চেষ্টাও যদি না করি, তাহলে এ মাসকে স্বাগত জানানো কেবল লৌকিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল।

অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করবেন, "আর রাসুল সা. বলবে, হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য করে রেখেছে।" (সুরা ফুরকান, আয়াত: ৩০)

এ অবস্থার উদ্ভব হলে আমাদের পারলৌকিক জীবনে মুক্তির কোনো আশা কি অবশিষ্ট থাকবে? আল্লাহ আমাদের সকলকে রমজানের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে কুরআনের আলোকে জীবনযাপনের তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক, শিক্ষক ও গবেষক

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবি সা.

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

পৃথিবীর প্রতিটা মানুষেরই মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে কিছু অধিকার রয়েছে। মানুষকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটা মানুষের রয়েছে মানুষ হিসেবে সম্মান ও নিরাপত্তা লাভের অধিকার। স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা অধিকার। খাদ্যগ্রহণের অধিকার। বাসস্থানের অধিকারসহ আরও নানা অধিকার। এসমস্ত অধিকারকে মানবাধিকার বলে। যেকোনো ধরনের জুলুম, নির্যাতন ও শোষণের প্রতিবাদ হিসেবে মানবাধিকারের ধারণা মানবসমাজে বিকশিত হয়েছে। মানবাধিকার বর্তমানে বিশ্বমানবতা ও সভ্য সমাজের স্বীকৃত অধিকার। এর বিস্তৃতি বিশ্বব্যাপী। এই মানবাধিকারের মধ্যে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকারও রয়েছে। মানবাধিকার বলে একজন মানুষ তার নিজ রাষ্ট্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধেও আন্তর্জাতিক মানবতা কর্তৃক নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। কাজেই মানবাধিকার সম্পর্কীয় আলোচনার পূর্বে আমাদের বুঝতে হবে—নাগরিক অধিকার আর মানবাধিকার দুটো এক নয়। তবে একটি অপরটির পরিপূরক হতে পারে। কেননা নাগরিক অধিকার হলো ব্যক্তির সেই অধিকার, যা রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে মানবাধিকার হলো ব্যক্তির সেই অধিকার, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত। কোনো ব্যক্তি তার নিজ রাষ্ট্রে নিজেকে নিরাপদ মনে না করলে মানবাধিকার বলে অন্য রাষ্ট্রের আশ্রয় নিতে পারে। মানবাধিকার বলে একজন শ্রমিককে তার নির্ধারিত সময়ের বেশি কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না। এমন আরও বহু বিষয় রয়েছে যেগুলো মানবাধিকারের আওতাভুক্ত।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানবতার মুক্তির অনুপম দূত। মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আর পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বজনবিদিত সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর জাতি হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হলো মুসলমান জাতি। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেন, ‘তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের

উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০) সমগ্র পৃথিবী যখন নানাবিধ অন্যায়-অনাচার আর অমানবিকতার আঁধারে নিমজ্জিত, ঠিক তখনই বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পৃথিবীতে প্রেরিত হন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেন, 'আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য পাঠিয়েছি কেবল রহমত হিসেবে।' (সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭) তাঁর আগমনের সময়টাকে বলা হয় 'আয়্যামে জাহিলিয়্যাত' তথা অন্ধকারের যুগ। চারদিকে তখন মূর্খতা, অন্যায়-পাপাচার, ঠুনকো কারণেই যুদ্ধবিগ্রহ, কন্যা শিশুকে জীবন্ত পুঁতে ফেলাসহ বহু অমানবিকার জয়জয়কার। সর্বদাই সবখানে ঘটছিল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুণে ধরা এই জাতির সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করতে লাগলেন। এ নিয়ে চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। নানাবিধ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। স্বপ্ন দেখতে থাকলেন একটি সোনার জাতি গঠনের। ধীরে ধীরে চারিদিকে শান্তির দ্যুতি ছড়াতে শুরু করলেন। তিনি মানবজাতির জন্য কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখতে তরুণ বয়সে গঠন করেন 'হিলফুল ফুজুল' নামে এক শান্তিসংঘ। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম শান্তিসংঘ হয়তো এটিই। মক্কার লোকজন তাঁর কাছে বিভিন্ন আমানত রাখত। তিনি সেগুলোর খেয়ানত করতেন না। তিনি কখনো কোনো মিথ্যা বলতেন না। এভাবে তাঁর প্রতি মক্কার লোকজনের যে অগাধ বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল, সে থেকেই তারা তাঁকে 'আল-আমিন' তথা বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁকে আল-আমিন বলে ডাকত। নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি যে কষ্ট-সাধনার মাধ্যমে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, এই ইসলাম ধর্মে মানবাধিকারের কোন বিষয়টি নেই!

ইসলাম বলে, পৃথিবীর সকল মানুষ একই উপাদানে এক রবের সৃষ্টি। সকল মানুষ একই পিতামাতা তথা আদম ও হাওয়া আ. দম্পতির সন্তান। সকল মানুষ একই রক্তে-মাংসে গড়া। ইসলাম মানুষের সাদা-কালো বর্ণে কোনো বিভেদ রাখেনি। আমরা পৃথিবীর সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত। ইসলাম মানুষ হিসেবে সকলকে সমান মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। কোনো মানুষ কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে তার জন্য শাস্তির বিধান রেখেছে। কুরআনে কারিমে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কোরো না।' (সুরা বনি

ইসরাইল, আয়াত: ৩৩) অনুরূপভাবে ইসলাম মানুষকে সকল প্রকার নিরাপত্তা লাভের অধিকার দিয়েছে। জীবনোপকরণ ও সম্পত্তি লাভের অধিকার দিয়েছে। ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে শিক্ষার শুধু অধিকারই দেয়নি; বরং ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ করেছে। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তি থেকে আমৃত্যু অনুপম দুঃখ-কষ্ট সয়ে এই ইসলাম প্রতিষ্ঠার পেছনেই পুরোটা জীবন ব্যয় করেছেন। ইসলাম ধর্ম যেহেতু মানবাধিকারের সমস্ত অধিকারই যথাযথ দিয়েছে, সেহেতু ইসলাম প্রতিষ্ঠা মানেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা। তিনি তার জীবদ্দশায় পৃথিবীতে সফলভাবেই ইসলাম ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। যা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য নজির হয়ে থাকবে। এটি অনস্বীকার্য সত্য। যা বর্তমান পৃথিবীর প্রসিদ্ধ অমুসলিম ঐতিহাসিকগণও নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন। অ্যামেরিকান বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ মাইকেল এইচ. হার্টের পৃথিবীর সেরা ১০০ জন মানুষের জীবনী নিয়ে রচিত বিখ্যাত (The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History) গ্রন্থটিতেও সবার শীর্ষে রয়েছেন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বইটি ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে যে কেউ চাইলে মুহূর্তেই এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখতে পারবে।

পরিশেষ, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। দ্বীনের যথাযথ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আর এই দ্বীনের মাঝেই রয়েছে প্রতিটি মানুষের মানবাধিকারের শতভাগ নিশ্চয়তা। তাঁর অবর্তমানে এই দ্বীন এবং এর মাঝে নিহিত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব উম্মতের। তাই আমাদের কর্তব্য হলো মহান এই দায়িত্ব যথাযথ পালনে সচেষ্ট থাকা।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

"সফল মানুষেরা কাজ করে যায়। তারা ভুল করে, ভুল শোধরায় কিন্তু কখনও হাল ছাড়ে না" (কনরাড হিলটন)

রমজানে মুমিনের করণীয়

শরিফ আহমাদ

রমজান একটি শ্রেষ্ঠ মাস। কুরআন-হাদিসে এ মাসের কথা গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। উসমান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন, শাবান আমার মাস আর রমজান আল্লাহর মাস। (শুআবুল ঈমান, হাদিস: ৩৮১৩)
এ মাসে বিভিন্ন ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর তাআলার সান্নিধ্যে অর্জন করতে হয়। আগে ভাগে রমজানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হয়। ইবাদাতের রুটিন তৈরি করে নিতে হয়। সেই ধারাবাহিকতায় সবার সুবিধার্থে রমজানে মুমিনের করণীয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

সিয়াম সাধনা করা:

রমজানে মুমিনের প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো রোজা রাখা। রোজা ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে একটি। হিজরতের আঠারো মাস পর রমজানের রোজা ফরজ করা হয়। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মুসলিম নর-নারীর উপর রমজানের রোজা ফরজ। বর্ণিত হয়েছে, হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছে। যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩) রোজার ফজিলত সম্পর্কে আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, যে লোক রমজান মাসের রোজা রাখবে ঈমান ও চেতনা সহকারে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১২৬৮)

তারাবির নামাজ আদায় করা:

একজন মুমিনকে দিনের বেলা রোজা আর রাতের বেলা তারাবির নামাজ আদায় করতে হয়। প্রতিটি আকেল, বালেগ নর-নারীর উপর এই নামাজ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তারাবির নামাজ ২০ রাকাত। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. রমজান মাসে ২০ রাকাত এবং বিতির পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস: ৭৬৯২; আল মুজামুল কাবির, হাদিস: ১২১০২) নিয়মিত এই নামাজ আদায়কারীর জন্য রয়েছে আলাদা পুরস্কার। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় রমজান মাসে

তারাবির নামাজ পড়বে, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৭)

কুরআন তিলাওয়াত করা:

রমজান মাসে মুমিন নারী-পুরুষকে অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়। খতম করতে হয়। কাজের ফাঁকে সময় বের করে কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। কেননা এ মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, রমজান মাস এতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়েতের জন্য এবং হেদায়েতের এমন স্পষ্ট নিদর্শন সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং (সত্য-মিথ্যার মধ্যে) চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়। (সুরা বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫) কুরআন তিলাওয়াত করা ও শোনা উভয়টা গুরুত্বপূর্ণ আমল। জিবরাইল আ. রমজানের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে রাসুল সা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তারা পরস্পর কুরআন শোনাতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬)

নফল ইবাদত করা:

রমজানে প্রত্যেকটি মুমিন নারী-পুরুষকে নফল ইবাদতের প্রতি আলাদা গুরুত্ব রাখতে হয়। বিশেষ করে রমজানে তাহাজ্জুদ আদায়ের প্রতি যত্নবান হতে হয়। রমজানে প্রত্যেক নেক আমলের প্রতিদান বাড়িয়ে দেওয়া হয়। একটি হাদিসে এসেছে রমজান মাসের একটি নফল ইবাদতের সওয়াব অন্য মাসের একটি ফরজ ইবাদতের সমতুল্য। মাদান ইবনে আবু তালহা রহ. থেকে বর্ণিত। রাসুলের আজাদকৃত গোলাম সাওবান রা. বলেন, রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর উদ্দেশ্যে অধিক সিজদা করো (নফল নামাজ পড়ো) কেননা তুমি যখনই আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সিজদা করবে, তখন এ দিয়ে আল্লাহ তাআলা তোমার মর্যাদা একধাপ বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করে দেবেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৯৭৭)

দান-সদকা করা:

রমজান মাসে নারী-পুরুষকে দানের হাত প্রসারিত করতে হয়। রমজান দান-সদকার শ্রেষ্ঠ মাস। মানুষকে ইফতার করানো বা টাকা দিয়ে সাহায্য করা প্রশংসনীয় কাজ। দ্বিগুন প্রতিদান পাওয়ার উপায়। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. দানশীলতায় সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। আর অন্য সময়ের চেয়ে রমজান মাসে তার

দানশীলতা অত্যাধিক হতো। কেননা জিবরাঈল আ. প্রতিবছর রমজান মাসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। রমজান শেষ হওয়া পর্যন্ত রাসুল সা. তার সামনে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। যখন জিবরাঈল আ. তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি কল্যাণ প্রবাহের (বসন্তের) বাতাসের চেয়েও অধিক দানশীল হতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৫৮০৪)

কদর ও ইতেকাফ:

রমজানের শেষ দশকে একজন মুমিনকে ইবাদাতের পরিধি বৃদ্ধি করতে হয়। কোমর বেঁধে আমল করতে হয়। বিশেষ করে লাইলাতুল কদরে জাগ্রত থেকে নেকি হাসিল করতে হয়। এই এক রাতের ইবাদত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং সওয়াব প্রাপ্তির প্রত্যাশায় লাইলাতুল কদরে কিয়াম (ইবাদত-বন্দেগি) করবে, তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ২০১৪) রমজানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করাও গুরুত্বপূর্ণ আমল। রাসুল সা. ইতেকাফ করেছেন। ইতেকাফকারী ব্যক্তির ভাগ্যে সহজে লাইলাতুল কদর নসিব হয়।

মাগফিরাত কামনা করা:

রহমত, বরকত আর মাগফিরাত নিয়ে রমজান। এ মাসে কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজগার, দোয়া দরুদের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে মাগফিরাত কামনা করতে হয়। জাহান্নাম থেকে পানাহ চাইতে হয়। তাওবার অশ্রুজলে অতীতের পাপরাশি ধুয়ে মুছে নব উদ্যমে জীবন সাজাতে হয়। রমজান পাওয়া সত্ত্বেও মাগফিরাত না পেলে ধ্বংস অনিবার্য। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, দুর্ভাগ্য হোক সেই ব্যক্তির যে রমজান পেল এবং তা অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তার মাগফেরাত হলো না। (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস: ৬৪৬) তাই প্রত্যেকটি মুমিনের করণীয় হলো রমজানে ইবাদাত বন্দেগির মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা সবাইকে তাওফিক দান করুন। আমিন।

নীলফামারী, রংপুর

প্রবন্ধ

আল কুরআনুল কারিম-অনুভবের বাতায়নে

নিয়ামুল ইসলাম

মাদরাসায় আসা হয়েছিল বাবার ইচ্ছায়। চতুর্থ শ্রেণির পর স্কুলে পড়ার ইতি ঘটে। বাবার এমন সিদ্ধান্তে ঘরেবাইরে অবাক হয়েছিল সবাই। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে যুগপৎ হতাশা ও আক্রোশ প্রকাশ করে যার যার জায়গা থেকে। স্বভাবতই একজন ডিফেন্সের সদস্য হয়ে সন্তানের জন্য এমন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আয়োজন দেখে সহজভাবে নিতে পারেনি কেউ। মায়ের অগাধ মমতাও বাবার পক্ষে ছিল না। কেবল বাবার ভীষণ চেহারার সামনে নিশ্চুপ ছিলেন তিনি। আমাদেরও বাবার সামনে রা করার মতো সাহস বা বয়স কোনোটাই ছিল না। সবমিলিয়ে মাদরাসায় ভর্তি হয়ে এলাম বোল নাফোটা শিশুটির মতোই নিশ্চুপে। সে দিনটি ছিল আমার জন্য এক মহা বিষণ্নাকীর্ণ, দুঃখভরা, দীর্ঘশ্বাসভারাক্রান্ত একটি দিন। সহসাই পুঞ্জীভূত মেঘের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল হৃদয়। অবশ্য দ্রুতই সে ঘনায়মান মেঘ কেটে যায়। ভালোলাগায় রূপান্তরিত হয় সবকিছু। মক্তবের সেই خيركم من تعلم القران و علمه এর অর্থব্যঞ্জনা আমার ভেতরে কোনো জিজ্ঞাসা বা কোনো নতুন ভাবনার সৃষ্টি করেছিল

কিনা জানি না। সম্ভবত কুরআন হিফজ সম্পন্ন হয় সে না-জানাকে সঙ্গে করেই। অবশ্য আমাদের প্রতি হতাশা ব্যক্তকারীদের আক্ষেপ তখন বিপুল শ্রদ্ধায় আন্দোলিত। কুরআনের হাফেজ হয়ে গেছি এ প্রসঙ্গে কথা উঠলেই কণ্ঠ তাদের আপ্লুত হয়। সে স্বরে চুইয়ে পড়ে রাশি রাশি মুগ্ধতা। কালামুল্লাহর প্রতি তাদের এ বিহ্বলতা আমাদের ভেতরেও জাগায় ভালোলাগার মৃদু শিহরণ। বগুড়ায় হিফজ সম্পন্ন হলে চলে আসি ঢাকায়। ভর্তি হই ইদারাতুল উলূম আফতাবনগর মাদরাসায়। শুরু হয় কিতাব বিভাগের এক নতুন জীবন। উচ্ছ্বল চোখেমুখে তাই আনন্দের ঝিলিক। হৃদয়ের গহনে এখন নতুন কিশলয়ের উঁকিঝুঁকি। মনের অলিন্দে প্রথম স্বপ্নের আনাগোনা। অজানাকে জানার উদগ্র বাসনা। উস্তাদদের জ্ঞানগরিমা আর মমতামাখানো পাঠদান ও নির্মল নির্দেশনায় বোধহীন আলগা বিশ্বাসগুলো এখন চেতনায় দীপিত আর গভীর। আরবি ভাষা শিখতে হবে। যা আমাকে পৌঁছে দেবে কুরআনুল কারিম উপলব্ধির দোরগোড়ায়। জানতে হবে আমাদের প্রতি মহান আল্লাহ তাআলার সম্বোধন। বলতে দ্বিধা নেই এ অনুভূতি সর্বপ্রথম জাগ্রত হয় 'এসো আরবি শিখি' পড়ার মধ্য দিয়ে। কিছুদিন পর সত্য সত্য কুরআনের কিছু আয়াত বুঝতে শুরু করলাম। তখন ভালোলাগার যে মূর্ছনা তৈরি হয়েছিল, তা কেবল অনুভবই করা যায়। তবে যাকে বলে রেখাপাত, সেটা হয়েছিল যখন কাফিয়া
জামাতে পড়ি তখন তরজমাতুল
কুরআনের প্রথম সবকে। فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين 'আপনার প্রাণ কি বরবাদ করে দেবেন (হে রাসুল) কেন এরা ঈমান আনছে না এই দুঃখে!' দয়াময়ের কী দরদিয়া সম্ভাষণ। উম্মতের প্রতি পেয়ারা হাবিবের ব্যথাতুর হৃদয়ের রক্তক্ষরণের কী অপূর্ব নির্মল প্রকাশ। কতটা ব্যথা-যন্ত্রণা, দগ্ধতা, কাতরতা হলে যিনি রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তিনি নিজে স্নেহার্দ্র ঈষৎ ভর্ৎসনা করে তাকে নিবৃত করেন আত্মবিনাশী এ ব্যাকুলতা থেকে! সেদিন এ আয়াতের সুর কুলকুল রবে বয়ে গেছিল আমার হৃদয়সায়রে। ঘণ্টাধ্বনির মতো হৃদয়বীণার তারে ঝংকার তুলেছিল ক্রমাগত। ভাবনার বিস্তৃত দিগন্ত জুড়ে ফুটেছিল কতশত পদ্ম। আবেগমথিত, ভাবনাআকুলিত, প্রাণরসে টইটম্বুর একটি দরস ছিল সেটি। এখনো ভাবলে সুবাসিতবোধে আপ্লুত হই। তন্ময়তায় হই আচ্ছন্ন। যে আচ্ছন্নতা আমাকে বেঁধে

রেখেছিল মাদরাসার নিরাপদ গণ্ডিতে। উদ্বুদ্ধ করেছিল রেজিস্ট্রেশনকরা স্কুলের বোর্ড পরীক্ষা বাদ দিতে। এক্ষেত্রে প্রধান ক্রিয়াশীল ছিল সেদিনের সেই দরসে কুরআনের প্রভাব। সবিশেষ এ আয়াতটি।

একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারব, এই একটি আয়াতই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে অবধারিত করার জন্য যথেষ্ট। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন হচ্ছে মানবতার পূর্ণ রূপায়ণ। সকল সৃষ্টির প্রতি তাঁর যে মমত্ববোধ ও দরদ এর কোনো তুলনা কখনো সম্ভব না। মানুষের কল্যাণকামিতায় পরিপূর্ণ ভরাট ছিল তাঁর মন। তাঁর পবিত্র হৃদয়ের সারাটা জুড়েই ছিল সমস্ত সৃষ্টির প্রতি খায়ের-খাহির ব্যঞ্জনায় আপ্লুত। কী বিপুল আকুলতায় জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া কেন্দ্রীভূত করেছিলেন মানবকল্যাণকে ঘিরেই। কী করে সকলের ভালো হবে, আল্লাহর স্মরণে উচ্ছ্বল হয়ে উঠবে সকলের যিন্দেগি, হেদায়াতে অভিসিক্ত হয়ে উঠবে কানায় কানায়—এই ছিল তাঁর একমাত্র ব্রত ও সংগ্রাম। মূলত তার এ আকুতিই বিধৃত হয়েছে পাক কুরআনের এই আয়াতে- فلعلك باخع نفسك الايكونوا مؤمنين প্রকৃতই আল কুরআনের প্রতিটি বাণীই এমন প্রাণোচ্ছ্বলায় পরিপূর্ণ। যার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে হেদায়াতের নুর এবং শিক্ষার দ্যুতি। যার জ্যোতির্ময় শিক্ষাগুলো সব যুগেই প্রতিভাত হয়েছে পথের পিদিমরূপে। আলোর মিনার হয়ে পথ দেখিয়েছে দিগভ্রান্ত পথিকদের। জীবনের ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে দিয়েছে এর দ্যোতনা। মুমিনমাত্রই এ সত্যতা স্বীকার করবে নির্দ্বিধ চিত্তে। সবিশেষ নিবেদন—কুরআনুল কারিম হোক আমাদের নিত্যপাঠ্য। আমাদের সকাল-সন্ধ্যা মুখরিত হোক কুরআনের সুললিত সুরে। তিলাওয়াতের দ্যোতনায় দীপ্ত হোক আমাদের হৃদয়জগৎ। সেই সঙ্গে সূচিত হোক কুরআন বোঝা ও উপলব্ধির নতুন জোয়ার। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

শিক্ষক, দারুল ফিকরি ওয়াল ইরশাদ ঢাকা।

একজন আদর্শ ছাত্রের গুণাবলি

• ইকরামুল ইসলাম

Student একটি সাধারণ ইংরেজি শব্দ। Student শব্দের কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ না থাকায় এর কোনো পূর্ণাঙ্গ রূপ নেই। তবে এর নিজস্ব অর্থ ও সংজ্ঞা আছে। Student অর্থ হচ্ছে ছাত্র, শিক্ষার্থী। সাধারণত যারা স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা করছে, আমরা তাদের Student বলে থাকি। অন্য সংজ্ঞায় এমন একজন ব্যক্তি যিনি একটি বিষয় সম্পর্কে গভীর চিন্তা, গবেষণা করেন, তিনি Student বা শিক্ষার্থী।

মানুষ সবার সাথে বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়েই সামনে এগিয়ে যায়। আমরা যখন ছাত্র অবস্থায় থাকি, তখন ভাবি চাকরির জীবন কত ভালো। আবার যখন ব্যস্তজীবনে প্রবেশ করি, তখন মনে হয় জীবনের সবচাইতে মধুর জীবন ছিল ছাত্রজীবন। তাইতো আলকা টিওয়ারি বলেছেন—'ছাত্রজীবন হলো সোনালি সময়, যে সময় সোনার কোনো দরকারই পড়ে না'। এই সময়টাতে জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। মানুষ কখনোই এই স্মৃতিগুলো ভুলতে পারে না। সময় গড়িয়ে গেলেই ফিরে যেতে চায় ছাত্রজীবনের সেই সোনালি সময়ে।

একজন ভালো ছাত্র হতে হলে নিজেকে একজন আদর্শ ছাত্র হিসেবে গড়ার শপথ নিতে হবে। সারাদিন-রাত বইয়ের পড়া পড়লেই কেউ ভালো শিক্ষার্থী হতে পারে না। একজন ভালো শিক্ষার্থীর অনেক গুণাবলি আছে। সেসকল গুণাবলি আত্মস্থ করার মাধ্যমে একজন আদর্শ শিক্ষার্থী, হওয়া যাবে ।

অর্থাৎ, পড়াশোনা করলে সত্যিকারের ছাত্র হওয়া যায় না। পড়াশোনার পাশাপাশি আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করতে হবে। তাহলেই একজন আদর্শ ছাত্র হওয়া যাবে।

একজন আদর্শ ছাত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য—

১. লক্ষ্য নির্ধারণ: যেকোনো কাজ করার আগেই আমরা তা কখন করব, কীভাবে করব, তা স্থির করি। ঠিক তেমনই একজন ছাত্রের প্রথম দায়িত্ব হলো তার লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

২. পরিশ্রমী হওয়া: ছাত্রজীবন থেকে পরিশ্রমী হওয়া প্রয়োজন। একজন আদর্শ শিক্ষার্থী হতে গেলে অবশ্যই পরিশ্রম করে লেখাপড়ায় নিজেকে এগিয়ে রাখতে হবে। তাই ছাত্রদের অলসতা ত্যাগ করে পরিশ্রমী হতে হবে।

৩. অধ্যবসায়: অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ অসাধ্যকে সাধন করে। বিজ্ঞানী নিউটনের উক্তি—আমার আবিষ্কার প্রতিভা প্রসূত নয়, বহু বছরের অধ্যবসায় ও নিরবিচ্ছিন্ন সাধনার ফল। তাই একজন আদর্শ ছাত্রের জন্য অধ্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম ।

৪. জানার আগ্রহ: একজন ভালো ছাত্র প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা রাখার চেষ্টা করে। একাডেমিক পড়ার বাইরে প্রতিদিন এক্সট্রা কিছু শেখে। তাই একজন আদর্শ ছাত্র হতে গেলে জানার কোনো বিকল্প নেই।

৫. সময়োপযোগী হওয়া: সময়নিষ্ঠা একটি বড় গুণ। যেসব শিক্ষার্থী সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করে না, তারা কখনোই কোনো কিছুতে ভালো ফল অর্জন করতে পারে না। তাই একজন আদর্শ ছাত্র হতে গেলে অবশ্যই সময়নিষ্ঠার অভ্যাস করতে হবে। সময়ের মূল্য দিতে হবে।

৬. সৃজনশীলতা অর্জন: একজন ভালো শিক্ষার্থী শুধু একাডেমিক পড়ালেখাতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। পাশাপাশি নতুন কিছু করারও চেষ্টা করে। যেমন: বিতর্ক, লেখালেখি ইত্যাদি। সৃজনশীলতার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী নিজের নতুন চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সমাজ ও দেশের উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে।

৭. ভালো ব্যবহার: একজন আদর্শ শিক্ষার্থী হতে গেলে অবশ্যই সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর পড়ালেখা, আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা ইত্যাদি সবকিছুই পরিমার্জিত।

৮. নিয়মানুবর্তিতা: শৃঙ্খলা ছাড়া মানবজীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে না। আমদেরকে নিয়ম- মাফিক পড়ালেখা করতে হবে। প্রতিদিনের পড়ার রুটিন তৈরি করে পড়ালেখা করা।

৯. সবকিছুতে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা।

১০. ক্লাসে কোনো কিছু না বুঝলে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে শিক্ষককে প্রশ্ন করা।

১১. পড়ালেখার প্রতি গভীর মনোযোগী হয়।

একজন আদর্শ ছাত্র হতে হলে, অবশ্যই সময়কে বেশি করে গুরুত্ব দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—'সময়ের কসম! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।' (সুরা আসর: ১-২) তাহলে আমাদের উচিত সময়মতো নামাজ আদায় করা, আল্লাহর আইন মেনে চলা, সময়মতো পড়ালেখা করা। তাহলে সহজেই আমরা একজন আদর্শ ছাত্র হতে পারব।

লক্ষ্মীপুর

রমজান ও কুরআন

মুহাম্মাদ হাসিবুল হাসান

রমজান মাস দুই দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এক. এ মাস রোজা পালনের মাস। দুই. এ মাস পবিত্র কুরআন নাজিলের মাস। আল কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য। কুরআনের নিজস্ব ভাষায় কুরআন 'হুদাল্লিন নাস', অর্থাৎ মানবজাতির জন্য উপদেশ; 'হুদাল্লিল মুসলিমিন' শুধু মুসলমানদের জন্য উপদেশ নয়।

পবিত্র কুরআনে সুরা বাকারার ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫ ও ১৮৭ এই আয়াতগুলোতে রমজান মাসে আল্লাহ তাআলা আমাদের রোজা রাখতে বলেছেন এবং রোজার বিধানসমূহ দিয়েছেন।

আমরা রোজা রাখি অনেকটা অভ্যাসবশত এবং আমাদের রোজা অনেকাংশে শুধু উপবাসই থেকে যায়, যেটা আল্লাহর কাছে মোটেই কাম্য নয়। মনে রাখতে হবে, রোজা নিছক উপবাস নয়, এর সঙ্গে নিয়ত ও নিয়ম সংশ্লিষ্ট আছে।

রোজা মানুষকে সংযম শেখায়। এটা মানুষের জন্য একটা বড় পাওয়া। রমজান যেমন রোজার মাস, তেমনই পবিত্র কুরআনের মাসও। রমজান মাসের সঙ্গে আল কুরআনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও সুগভীর। ফলত রমজান মাস হচ্ছে রোজার মাস; তাকওয়া বা খোদাভীতির মাস; রহমত, বরকত, নাজাত ও মাগফেরাতের মাস; বিশেষ করে কুরআনুল কারিমের মাস।

কুরআনুল কারিম রমজান মাসকে ভালোবাসে। রমজান ভালোবাসে কুরআনকে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজেই ঘোষণা করেছেন, 'রমজান মাস, এতে মানুষের দিশারি এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।' (সুরা বাকারা: ১৮৫)

কাজেই মাহে রমজান পবিত্র কুরআন নাজিল বা অবতরণের মুবারক মাসও বটে।

এই রমজান মাসেই ঐশীগ্রন্থ কুরআন 'লওহে মাহফুজ' হতে নিকটবর্তী আসমানে নাজিল হয়েছিল। ফলে রমজান পবিত্র কুরআন নাজিল বা অবতরণের সম্মানে সম্মানিত মাস। এ কারণেই হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে কুরআনের দাওর বা পুনরাবৃত্তি বা

তিলাওয়াত করতেন। অধিক পরিমাণে তিনি কুরআন তিলাওয়াত শুনতেন। নিজে বেশি বেশি তিলাওয়াত করতেন এবং মানুষকে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করার তাগিদ দিতেন। এ মাসে তিনি অধিক পরিমাণে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করতেন।

মহানবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ছায়াতলে নিজের জীবন কাটানোর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং উম্মতকে কুরআনের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন ও কুরআনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন, 'আমি এ মুবারক গ্রন্থ আপনার ওপর নাজিল করেছি। যাতে করে মানুষ এর আয়াতসমূহের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করতে পারে এবং জ্ঞানী লোকেরা এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।' (সুরা সোয়াদঃ ২৯)

বিশ্বমানবতার মুক্তির পথনির্দেশনাস্বরূপ পবিত্র রমজান মাসে নাজিল হওয়া পবিত্র ঐশীগ্রন্থ আল কুরআন ও রমজান মাসের মধ্যে যে নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক হবে, এটাই স্বাভাবিক। রমজান মাসে কুরআন তিলাওয়াত, চর্চা ও গবেষণার একটি আলাদা মজা ও আলাদা স্বাদ রয়েছে। রমজান মাস যেন কুরআনের সুবাসে আমোদিত থাকে। ব্যক্তিগত তিলাওয়াত ও তারাবি নামাজের তিলাওয়াতের মাধ্যমে রমজান মাসে নুজুলে কুরআন বা কুরআন নাজিলের অম্লান স্মৃতি যেন প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর মধ্যে জাগরুক হয়।

পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে মহানবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ উম্মতের জন্য রেখেছেন, যা রমজান মাসকে সামনে রেখে পুনরায় আলোচনা ও পুনরাবৃত্তি করা জরুরি।

১. তোমরা কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করো। কারণ কুরআন শেষ বিচার দিবসে তার তিলওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আসবে।

২. তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শেখে, অন্যকে শিক্ষাদান করে।

৩. যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং কুরআন পাঠে দক্ষ হয়, সে সম্মানিত লিপিকার ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে। আর যে কুরআন পাঠ করে এবং কুরআন পাঠ করতে আটকে যায় (কষ্ট করে করে কুরআন চর্চা ও পাঠ করে), তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান। ৪. তোমরা দুই উজ্জ্বল আলোকময় সুরা বাকারা এবং সুরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করো। কারণ, এ দুটি সুরা শেষ বিচারের দিবসে দুটি মেঘখণ্ড অথবা দুইটি সামিয়ানা অথবা দুটি পক্ষ প্রসারিত পাখির ঝাঁকের রূপে আসবে এবং তার পাঠকারীকে ছায়া দেবে।

এমনিভাবে পবিত্র কুরআনের প্রতিটি সুরা ও আয়াতের গুরুত্ব, সম্মান, মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনার শেষ নেই। বিশেষত রমজান মাসে কুরআনের তিলাওয়াত ও

চর্চার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে মাহে রমজানে মুসলিম উম্মাহর ঘরে ঘরে চলে কুরআন চর্চা। ঘরের প্রতিটি সদস্য প্রতিক্ষণ কুরআনের তেলাওয়াতে এমনভাবে মশগুল থাকে, যেন মনে হয় সুমিষ্ট মধু নিয়ে গুঞ্জরণ করছে মৌমাছি।
মুসলমানগণ ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও চর্চার মাধ্যমে এই ঐশী বিধানসমূহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে। কেননা, কুরআন 'সিরাতে মুস্তাকিম' বা কল্যাণের পথ দেখায়। কুরআন অন্তরের নূর বা আলোকরশ্মি-স্বরূপ। মানসিক বিভ্রান্তি ও রোগের শেফা বা চিকিৎসা হলো আল কুরআন। কুরআনের অপর নাম হলো ফুরকান, যা সত্যের পথে চালিত করে। কুরআন মানুষের সৌভাগ্যের দিক-নির্দেশনা, চির মুক্তির সনদ, জীবন-যাপনের পথে পালনকর্তার বিধানের ভান্ডার।
ফলে কুরআনের ছায়াতলে জীবন কাটানোর মানে হলো সামগ্রিক নিরাপত্তার মধ্য থেকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে অবস্থান করা এবং কুরআন তিলাওয়াত ও চর্চার মাধ্যমে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার আদেশ ও নিষেধের অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণের অধিকারী হওয়া।
কুরআন মাজিদ মানবজীবনের অকাট্য সংবিধান, বিশেষত মুসলমানদের জন্য। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এ বিশেষ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে হলেও রমজান মাসে অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত। আর রমজানে কুরআন তিলাওয়াত করলে যে তিলাওয়াতকারীর জন্য তা সোনায় সোহাগা হবে, সেটা সহজেই অনুমেয়। রমজানের বিশেষত্বই কুরআন। প্রতি রাতে কুরআন খতম দিয়ে যেন মুসলিম উম্মাহকে এ মহান শিক্ষাই দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা।
মাহে রমজানে সর্বক্ষণ কুরআনের সাথে তিলাওয়াত ও অর্থ অনুধাবনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিয়োজিত থেকে নিজেদের কল্যাণময়, বরকতময় ও নিরাপদ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর কর্তব্য। তাই আসুন আমরা কুরআন নাজিলের মাসে অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করার চেষ্টা করি। পবিত্র রমজান মাসের অতি মূল্যবান ও মুবারক সময়ে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের গুরুত্ব তথা আজমত বুঝে আমল করে আমাদের জীবনকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করি; এবং এ কাজে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে আমরা কেউ যেন পিছপা না হই।

শিক্ষক ও কথাসাহিত্যিক

অফুরন্ত কল্যাণ বয়ে আনা রমজান

মাওলানা আব্দুর রহমান

হিজরি বর্ষের নবম মাসটি রমজানুল মোবারক। যে মাস মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্বে অন্যান্য মাস অপেক্ষা অনন্য। যে মাস নিজ মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। কারণ ইসলামে পঞ্চ বুনিয়াদের সিয়াম একটি; যা এ মাসে অবশ্য পালনীয়। সারা জাহানের মুক্তির ঐশি বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন; যার অবতীর্ণকাল উক্ত মাসেই। শুধু কি তা! না, এ মাসের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি অসংখ্য। যেমন দীর্ঘ হায়াত প্রাপ্ত উম্মতের নেক আমলের সাথে স্বল্প হায়াতধারী উম্মতে মুহাম্মদির নেক আমল বরাবর হওয়ার একমাত্র উপায় হলো রমজান মাস।

রোজার পরিচয়:

সওম শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো বিরত থাকা, সংযত হওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় সওম বলা হয়, সুবহে সাদেক তথা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ, মানবিক লোভ-লালসা ও নফসানি চাহিদা চরিতার্থ করার কেন্দ্রস্থল—খাদ্য পানীয় ও নারী উক্ত তিন উপায়-উপকরণ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সকল

প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেকে সংযত ও সুসংহত রাখা।

রোজার প্রকার:

আদেশ নিষেধের বিচারে রোজা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার নির্দেশের বিবেচনায় তা দুই প্রকার (১) ওয়াজিব রোজা। তা আবার দুই প্রকার (ক) বান্দার কোনো হাত ছাড়া শরিয়তে যা আদায় করা অপরিহার্য, এটাই হলো রমজানের রোজা (খ) মৌলিকভাবে যার বিধান শরিয়তে ওয়াজিব নয় বরং বান্দাকর্তৃক কোনো কারণবশত তা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন, কাজা, কাফফারা ও মানতের রোজা।

(২) মুস্তাহাব। তাও দুই প্রকার। (ক) সাধারণ নফল রোজা; যা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সাথে শর্তযুক্ত নয়। (খ) শর্তযুক্ত নফল রোজা; যেমন, শাওয়ালের ছয় রোজা, আশুরা ও আরাফার দিনের রোজা। দ্বিতীয় প্রকার নিষিদ্ধ রোজা, যা পালন করা শরিয়তে নিষেধ। যেমন, দুই ঈদের ও তাশরিকের দিনগুলো।

রোজার ফজিলত:

১. আল্লাহ তাআলা এর প্রতিদান নিজে দেবেন। হাদিসে কুদসিতে রাসুল সা. ইরশাদ করেন—আল্লাহ তাআলা বলেন, রোজা আমার জন্য আর আমি নিজে এর প্রতিদান দেবো।

২. রোজা কেয়ামত দিবসে রোজাদারের জন্য সুপারিশ করবে। ৩. রোজা এমন একটি কর্ম, যার কর্তার জন্য আল্লাহ তাআলা ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ৪. সিয়াম সমস্ত গুনাহ ও পাপ রাশির কাফফারা। ৫. রোজা জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঢাল ও সুরক্ষা দুর্গ। ৬. রোজার আধিক্যতা জান্নাত লাভের মাধ্যম। ৭. আল্লাহ তাআলার নিকট সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ মৃগনাভি সুগন্ধি অপেক্ষা অতি উত্তম। প্রজ্ঞাময় মহান মালিকের কোনো কর্মই হেকমত ও বান্দার কল্যাণ থেকে খালি না। তদ্রূপ রোজাও। বান্দার উপর রোজার বিধান ফরজ করার অনেক গুরুত্বপূর্ণ হেকমত বিদ্যমান, এর মধ্য থেকে মোটাদাগে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

১. রোজা হলো আল্লাহর প্রতি বান্দার তাকওয়া যাচাই-বাছাই করার একটি অন্যতম মাধ্যম।

২. বান্দার উপর তার রবের অসংখ্য নিয়ামত বিদ্যমান—এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

৩. সহনশীলতা শিক্ষা লাভ।

৪. নিজ কামনা-বাসনা ও শয়তানকে দমন করার যোগ্যতা অর্জন করা।

৫. রোজা দরিদ্রদের উপর দয়া ও মায়া বাড়ায়।

৬. রোজা বর্জ্য পদার্থ থেকে দেহমনকে পবিত্র করে সুস্থতা ও শক্তি এনে দেয়।
আমাদের একান্ত কর্তব্য হলো, এ মাসের ফজিলত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যাবলি জেনে যথার্থ মূল্যায়ন করা, এবং তার যথেষ্ট যোগ্য কদর করে অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করত অনন্ত জগতের পাথেয় ও সামানা সংগ্রহ করে চূড়ান্ত পর্যায়ের সফলতা লাভে ধন্য হওয়া।
প্রকৃত জ্ঞানী সেই, যে ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পড়ে চিরস্থায়ী অনন্ত-অসীম জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেকে বরবাদ করবে না। হে আল্লাহ আমরা যেন তোমার এই স্পেশাল অফার ও সুবর্ণ সুযোগ যথেষ্ট কাজে লাগিয়ে তার শাশ্বত সুফল লাভ করতে পারি, সেই তাওফিক আমাদের দাও। আমিন।

শিক্ষক, জামিয়া হামিদিয়া কর্ণপুর। শ্রীপুর, গাজীপুর।

"আপনি যদি একটি জাতিকে কোনরকম যুদ্ধ ছাড়াই ধ্বংস করে দিতে চান, তাহলে তাদের তরুণ প্রজন্মের মাঝে অশ্লীলতা আর ব্যাভিচারের প্রচলনের ব্যবস্থা করে দিন।"

>> সুলতান সালাহ আদ-দ্বীন ইউসুফ আইয়ুবী (রহিমাহুল্লাহ)

কথার আদ্যোপান্ত

• দ্বিপ্রহর

পশ্চিম আকাশে হাসছে জিলহজের পাঁচ তারিখের চাঁদ। বাঁকা চাঁদের হাসিতে সন্ধ্যার অন্ধকার যেন থমকে আছে। চাঁদ থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে শুকতারা। দক্ষিণ আকাশে সাদা সাদা মেঘ। একটা বিমান নিঃশব্দে চলতে চলতে প্রবেশ করল দক্ষিণের মেঘরাজ্যে। আমি শুকতারার দিকে তাকালাম।

তারপর চোখ দিয়ে মেপে নিলাম চাঁদ থেকে তার দূরত্ব। সবকিছু কেমন বেখাপ্পা লাগল আমার কাছে। কারণ, শুকতারাটি বিষণ্ন। অনিমেষনেত্রে তাকিয়ে আছে চাঁদের দিকে।

তবে চাঁদ থেকে তার দূরত্ব অনে-ক। অথচ সে এক কদমও সামনে হাঁটছে না। আমার খুব করে মনে হলো— চাঁদকে কিছু একটা বলতে চাচ্ছে শুকতারা। কিন্তু সাহস করতে পারছে না। মন কাউকে একটা কথা বলতে চাওয়ার পর, বলতে না পারার অনুভূতি 'অপেক্ষা'র চেয়েও জটিল। বলতে চাওয়া কথা বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং কথার ভিন্নতায় অনুভূতির তারতম্য হয়ে থাকে। একটু নমনীয় ভাষায়–

বললে—'ভালোবাসি' কথাটি কাউকে জানানোর তীব্র ইচ্ছে আর 'তোমাকে সহ্য করতে পারি না' কথাটা বলার ইচ্ছের মাঝে ব্যাপক তফাত পরিলক্ষিত হয়। অন্ধকার সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে গভীর হচ্ছে। চাঁদের সৌন্দর্য

ক্রমে বেড়ে চলছে। কিন্তু শুকতারা মলিনতার ধুলো মেখে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। চাঁদের খেয়ালের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সে। আমি বুঝতে পারলাম না, কী এমন কাজ চাঁদের হাতে—যে, একটিবার দৃষ্টি দিচ্ছে না শুকতারার দিকে! সাধ্য থাকলে চাঁদকে বকে দিতাম কয়দা করে। বলতাম, একবার ফিরে তো দ্যাখ, কেন সে দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই সন্ধ্যা থেকে।

খানিক বাদে দেখি ক্রমশ লঘু হচ্ছে চাঁদ ও শুকতারার দূরত্ব। একটু একটু করে চাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শুকতারা। হয়তো কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত হবে চাঁদের পাশে। অল্প অল্প করে বলতে বলতে বলে দেবে সব কথা। কিন্তু সব কথা কি একবারে বলা সম্ভব? হয়তো অসম্ভব।

কত কথা বলার থাকে কতজনের সাথে, তবে সব কথা তাদেরকে জানানো হয় না কোনো দিন। প্রতিদিন পৃথিবীতে কতজনের মৃত্যু হয়। প্রতিটা লাশ নিজের সাথে নিয়ে যায় অনেক কথা। কোনো লাশ মাটিতে প্রোথিত হয় জমানো কথার সাথে। কেউ আবার জমানো কথাসহ আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়।

অথচ পৃথিবীতে পড়ে থাকা একটা দেহ রাতের ঘুম হারিয়ে ভাবতে থাকে—যে চলে গেল, সে কেন বলে গেল না একটু কথা! যাওয়ার আগে কি সে আমাকে খুঁজেছিল একটু কথা বলার জন্যে? না-কি আমাকে ঘিরে তার কোনো কথা ছিল না কোনো কালে?

পুনশ্চ, প্রতিটা মানুষের জন্য মনের ভাব প্রকাশ করা অপরিহার্য। আর মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য সবচেয়ে সুন্দর ও সহজ মাধ্যম হলো কথা বলা। এজন্য কথা বলতে হয়। কথা বললে মন হালকা হয়। আর কথা না বললে কথার ছটফটানিতে বুকে হয় ক্ষত। বাড়তে থাকে জখম।

প্রাবন্ধিক, কথাশিল্পী, কবি। সদর,খুলনা।

তোমার কলমের দু'ফোটা কালি, বা তোমার চোখের দু'ফোটা অশ্রু যদি কারো কষ্টের জীবনে সামান্য সান্ত্বনা বয়ে আনতে পারে তাহলে তুমি বড় ভাগ্যবান।

বাবা মানেই বটবৃক্ষ

◆ মাহবুবা সিদ্দিকা

বার্ধক্যের শেষ বয়সটাতে বাবা নামের মানুষটার কে কতটুকু খবর রাখে? বাবা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সন্তান লালান-পালনের দায়িত্বে সদা-সর্বাদা অব্যাহত থাকেন। সন্তানদের কখনো বুঝতে দেন না তাদের অভাব। বাবার হাড়ভাঙা কষ্টের টাকায় আরাম-আয়েশের জীবন পার করছি। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছি। বিলাসবহুল প্রাসাদে থাকি। দামি গাড়িতে চড়ি। বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা ফুর্তিতে মেতে উঠি।

একটিবারের জন্যও জানতে চাই না—এই টাকা আসে কোত্থেকে! কতটা পরিশ্রমের পর এই টাকা আসে। কখনো জানার চেষ্টাও করি না—বাবার কষ্ট হচ্ছে কি-না। বাবার পকেটে প্রয়োজনীয় আরও টাকা আছে কি-না। কখনো আমরা জিজ্ঞেস করি না—বাবা, আমাদের খরচ জোগাতে কষ্ট হয় তোমার? বাবার হাত দুটো ধরে কখনো দেখি না পরিশ্রমের কারণে হাতে ব্যথার পরিমান কতটুকু। কখনো বাবার ঘামঝরা মলিন চেহারার দিকে তাকাই না। বাবা দিনকে রাত করে, রাতকে দিন করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের জন্য উপার্জন করেন।

বাবা নামের মানুষদের কখনো কোনো চাহিদা থাকে না। তারা সন্তানদের চাহিদার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কোন সন্তানের কী লাগবে, কে কী খাবে—সেই চিন্তায় মত্ত থাকেন বাবা। একটা ছেলে পূর্ণবয়স্ক হওয়ার আগে তার কাঁধে সংসারের চাপ চলে আসে। যুবক বয়সটাতে শ্রম দেয় মা-বাবা ও ভাই-বোনদের জন্য। তারপর পূর্ণ বয়সটাতে নিজ পরিবার চলে আসে। তখন থেকে শুরু হয় জীবনযুদ্ধ। পৃথিবীর আলোতে আলোকিত হয়ে আসে বাবার স্বপ্নচারী।

সন্তানটাকে বুকের উপর রেখে লালন করতে থাকে নিঃস্বার্থভাবে। সন্তানের আকাশ ছোঁয়া স্বপ্নের পেছনে বাবা দৌড়াতে থাকেন। একজন বাবা-ই পারেন তার সন্তানদের স্বপ্ন পূরণ করতে। এখন আর বাবার কোনো স্বপ্ন নাই। নাই কোনো চাওয়া-পাওয়া।

সবকিছু ঘিরে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কাম্য। বাবা সন্তানের জন্য প্রখর রোদে বটবৃক্ষের ছায়া। বাবা নিরলস। বাবার একনিষ্ঠ পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় সন্তানেরা।

ধীরে ধীরে বাবার বয়স বাড়তে থাকে। এখন আর বাবা আগের মতো কাজবাজ করতে পারেন না। বাবা পরিশ্রম করার মতো বয়সে এখন আর নেই। বাবা প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছেন। এদিকে সন্তানেরা বড় হয়েছে তার পাশাপাশি তাদের চাহিদাগুলোও বেশ বড়ো হচ্ছে। এখন বাবার ভূমিকা সংসার থেকে অনেকটাই কমে গেছে। বাবার কথা আগের মতো এখন আর ভালো লাগে না। বাবা একটার উপরে আরেকটা কথা বললেই কারও সহ্য হয় না। অথচ বাবা তার সন্তানের স্বপ্ন পূরণের আশায় নিজে কখনো ভালো খাবার খাননি। ভালো কোনো জামা পরিধান করেননি।

একজন বাবা একাধিক সন্তানের দায়িত্ব বহন করেন, কোনোরূপ নেতিবাচক দিক ছাড়া আর একাধিক সন্তান একজন বাবার দায়িত্ব বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে।

বাবা যখন রোজগার করতেন, তখন সন্তান, নাতি-পুতি সবাই বাবাকে ঘিরে রাখত। বাবা তাদের বায়নাগুলো পূরণ করতেন। আজ বাবা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। এখন আর কারও বায়না পূরণ করতে পারেন না। তাই বাবার প্রতি সবার বিরক্তি চলে আসছে। ঘরে ভালো ভালো খাবার রান্না হয়, অথচ বাবার প্লেটে ওঠে বাসি ডাল। ঝুটা খাবার। আজ বাবার শক্তি নেই টাকা রোজগার করার, তাই মুখ বুজে বাসি-পান্তা খেতে হয়। নাতি-পুতিদের ডাক দিলে কাছে আসে না। বিরক্তিভাব প্রকাশ করে।

বাবা তার সর্বস্ব উজার করে প্রতিটা সন্তানের দায়ভার একাই বহন করেছেন কোনো স্বার্থ ছাড়া। এত কষ্টের সন্তান আজ বাবাকে বলে তোমার মতো বৃদ্ধ ঘরে না থেকে দুই লক্ষ টাকা ঋণ থাকা অনেক ভালো।

এটাই কি একজন আদর্শ সন্তানের পরিচয়! এটা কি আমাদের মনুষত্ব! আমাদের বিবেক! যে বাবা এতকিছু করেছে আমাদের জন্য, তার জন্য কি আমাদের কিছুই করার নেই? আমাদের সুবোধ হোক।

সোনারগাও , নারায়ণগঞ্জ

শোকর তোমার রাব্বি

(মুক্তগদ্য)

>> শুয়াইব আল হামিদ

আঁধারে যখন চারপাশ হয়ে ওঠে গোরস্তান সদৃশ, কোমল উপাধানে মাথা ঠেকিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিই তখন—একটুখানি প্রশান্তির খোঁজে। নিঝুম-নিস্তব্ধ রাতের প্রশান্তিময় ঘুমে কেটে যায় দিনমানের কষ্ট-ক্লেশ আর সমূহ ক্লান্তি অবসাদ। দেহজুড়ে অনুভূত হয় এক অপূর্ব তৃপ্তি। ঘুমঘরে হঠাৎ বেজে উঠে 'আল্লাহু আকবার'-এর সুমধুর ধ্বনি। পাখপাখালি কিচিরমিচির শব্দে তাসবিহ জপে মহামহীয়ান প্রভুর।

বরকতময় ফজরের উপস্থিতি দেহ-আত্মায় এনে দেয় অনাবিল শান্তি। খুলে দেয় সুখ-সমৃদ্ধির প্রশস্ত দুয়ার। হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে প্রভুভক্তির নিরঙ্কুশ চেতনা। মনেপ্রাণে সৃষ্টি করে ইবাদতের প্রতি তুমুল জাগরণ।

নামাজান্তে কালামুল্লাহ শরিফের মনোমুগ্ধকর তিলাওয়াত—আত্মশুদ্ধির পথে রাখে জাদুকরী ভূমিকা। আত্মপ্রণোদনার শিকার হয়ে যখন পথ ভুলে যাই, কুরআন আমায় কাছে টেনে নেয় তার ছত্রছায়ায়। সহজ-সরল মায়াবী প্রাঞ্জল ভাষায় বাতলে দেয় আমার চলার পথ। দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠার ভারে যখন নুয়ে পড়ি, দুঃখ বা শোকে যখন থাকি মুহ্যমান, মাথায় যখন পেরেশানির মস্ত পাহাড়; এমনকি হারিয়ে ফেলি মানসিক শক্তিটাও, কুরআনের পরশে হৃদয়ে জ্বলে ওঠে মানসিক প্রশান্তির দীপ্ত প্রদীপ। আল কুরআনের স্নিগ্ধ পরশে মন-মস্তিষ্কে ছড়িয়ে যায় স্থিতিশীলতার ছোঁয়া। যার ফলশ্রুতিতে ডুবে যাই পরকালের অনিঃশেষ অফুরন্ত নিয়ামত লাভের চিন্তাসাগরে।

স্রষ্টার অনুপম সৃষ্টি, সবুজ-শ্যামল ছায়াঘেরা নয়নাভিরাম মনোরম দৃশ্যে জুড়িয়ে যায় আঁখিযুগল। সকালের নির্মল মৃদু সমীরণে সৃষ্টি হয় এক দারুণ অনুভূতি। প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়া যেন পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয় রাব্বে কারিমের শোকর-গোজারির কথা। খানিক বাদে ধূমায়িত চায়ের কাপে উষ্ণ চুমুকে ফিরে পাই সঞ্জীবনী শক্তি। এভাবেই শুরু হয় আমার প্রতিদিনের মিষ্টি প্রভাত। সবই তোমার দান, শোকর তোমার ইয়া রাব্বি।

শাহজাদাপুর, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

স্বপ্ন, সাধনা ও সফলতা

যাকারিয়া মাহমুদ

মানুষ স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকে। না-কি স্বপ্নই বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে! সে যাই হোক, একটা কথা তো অনস্বীকার্য—মানবজীবন সুখ-সমৃদ্ধ করতে, সফলতার শীর্ষচূড়ায় পৌঁছতে স্বপ্নের বিকল্প নেই। কারণ, মৃত্যুর পরও স্বপ্ন জীবনকে অমর করে রাখে। পুষে রাখে মানুষের হৃদয়-গভীরে।

ঘুমের স্বপ্নের কথা বলছি না। এ স্বপ্ন তো সামান্য সময়ের ব্যাপার। মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়। বলছি এক দীর্ঘ স্বপ্নের কথা। যা কিনা মানুষকে সফলতার রাজপথ দেখায়। ফলে, কবি না হলেও কবিতার আসনে আসীন হয় জীবন।

একটা শিশু জন্মের পর তার নিজস্ব কোনো স্বপ্ন থাকে না; বরং তাকে ঘিরে তখন অজস্র স্বপ্ন বোনে বাবা-মা, ভাই-বোন, আপনজন। ছোট্ট নিষ্পাপ সেই শিশুটির মুখপানে চেয়ে তারা কত কীই-না ভাবে! হারিয়ে যায় কল্পনার অথই-অকূল সাগরে।

ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে শিশু। সেই সাথে বড় হয় কল্পনার পরিধি। দিন-মাস-বছর পেরিয়ে শৈশবের সবুজ মাড়িয়ে, শিশুটির যখন উপনীত বয়স। তাকেই গ্রহণ করতে হয় স্বীয় স্বপ্নের ভার। কাছের মানুষগুলো একে একে দূরে সরে যায়। দর্শকের গ্যালারিতে বসে তারা হাসে, কাঁদে, উৎসাহ দেয়। কেউবা অবহেলা করে। এড়িয়ে চলে। শত্রু হলে মেতে ওঠে ঠাট্টা-তামাশায়।

স্বপ্নের ভার বয়ে-চলা সেই মানুষটিকে তখন হতে হয় অতি উদ্যমী, কঠোর পরিশ্রমী, অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহনশীল। খুলে দিতে হয় মোনাজাত আর রোনাজারির বাঁধন।

স্বপ্ন-সাধনায় সফল হতে এ বৈশিষ্ট্যবলি অবশ্যই থাকা চাই। নচেৎ বড় হবার এ স্বপ্ন, ঘুমের ঘোর-স্বপ্নের মতোই নিমিষে শেষ হয়ে যাবে। তাই যেমন উদ্যমী ও পরিশ্রমী হতে হবে, তেমনই হতে হবে ধৈর্যশীল ও সহনশীল। রবের দরবারে হাত তুলে কাঁদতেও হবে অসংখ্য রজনি।

পৃথিবীর ইতিহাসে যারা স্বজাতির আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত। অমর হয়ে যারা আজও মানুষের মন-মানস ও মগজে জীবিত। এসব বৈশিষ্ট্য ছাড়া তাদের কেউ স্বপ্নপূরণে কামিয়াব হয়নি।

হয়তো বলবেন ইসলামের ত্রিসীমায় আসার সৌভাগ্য যাদের কখনোই হয়নি। স্বপ্ন-সাধনায় তারাও কি মোনাজাতে নিমগ্ন হয়েছেন? স্বপ্নের শীর্ষচূড়ায় পৌঁছুতে কান্নার বাঁধন খুলেছেন?

বলব—এক প্রভুর দরবারে হয়তো তারা দুখানা হাত তোলেনি। চোখের কোণ ভিজিয়ে আল্লাহকে হয়তো কখনোই ডাকেনি। তবে তাদের বাস্তব-জীবনে লক্ষ করলে দেখতে পাবেন—জীবনের অসংখ্য নিশীথে, সাধনার কড়া কষাঘাতে যখন ধৈর্যের বাঁধন ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। অনিচ্ছায় কপাল চাপড়ে তারা কেঁদেছেন। প্রবল আবেগে তখন হয়তো তাদের ব্যাকুল ব্যাথাতুর মন খুঁজেছে—কোনো এক অদৃশ্য শক্তি। যার সাহায্যে ছোঁয়া যায় স্বপ্নের শীর্ষচূড়া। যেখানে সফলতার হাস্যোজ্জ্বল হাতছানি।

শিক্ষার্থী, মারকাযুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া, উত্তর বাড্ডা।

বিলুপ্তির পথে ঐতিহ্যবাহী কাচারিঘর

✷ ইব্রাহিম হাসান হৃদয়

কাচারিঘর ছিল গ্রামবাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির একটি অংশ। কালের বিবর্তনে আজ কাচারিঘর বাঙালির সংস্কৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ জনপদেও তেমন দেখা যায় না। কোথাও কোথাও ভেঙেচুরে অযত্নে পড়ে থাকা কাচারিঘরের হয়তো সন্ধান মেলে।

গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও ধার্মিক পরিবারের মূল বাড়ির একটু বাহিরে আলাদা খোলামেলা এই কাচারিঘর। অতিথি, পথচারি কিংবা সাক্ষাৎপ্রার্থীরা এঘরেই এসে বসতেন। কাচারিঘর ছিল বাংলার অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থের আভিজাত্যের প্রতীক। কাঠের কারুকাজ করা টিন অথবা শণের ছাউনি থাকতো কাচারিঘরে। আলোচনা, সালিশি, গল্প-আড্ডার আসর বসতো কাচারিঘরে।

পথচারীরা এই কাচারিঘরে ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নিতেন। বিপদে পড়লে রাতযাপনের ব্যবস্থা থাকতো কাচারি ঘরে। আবাসিক গৃহশিক্ষকের থাকার ব্যবস্থা থাকতো এঘরেই। এসব কাচারিঘর সকালবেলা মক্তব হিসেবেও ব্যবহৃত হতো।

ঈশা খাঁর আমলে কর্মচারীদের খাজনা আদায়ের জন্য কাচারিঘর ব্যবহার করা হতো। জমিদারি প্রথার সময়ও খাজনা আদায় করা হতো গ্রামের প্রভাবশালী গ্রাম্যমোড়লের বাড়ির সামনের কাচারিঘরে বসে। ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার সব ঐতিহ্য। হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের ভালোবাসা, ঐক্য, মিল ও বন্ধন।

ফিরে আসুক কাচারিঘরের সেই দিনগুলো। জমে উঠুক আবারও আড্ডা, গল্প আর ভালোবাসার আবেশে।

সোনাগাজী, ফেনী

পথশিশুর সুখ

নুসরাত জাহান জেরিন

জামিলা তার একমাত্র ছেলে সাহেবকে নিয়ে বসতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে। যদিও ছেলেটা জীর্ণ-শীর্ণ ও কঙ্কালপ্রায়, তবুও সুদর্শন। সাহেবের বাবা ওর জন্মের কিছুদিন পরেই এক রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। একই অ্যাক্সিডেন্টে পা হারায় জামিলা। স্বামীহারা জামিলা এতিম সাহেবকে অনেক কষ্ট করে বড় করে। সাহেব এখন দশ বছর বয়সি। ওরা ফুটপাতে থাকে, পলিথিনে ঘেরা সংকীর্ণ একটা জায়গায়। সেখানে সাহেব আর ওর মা গুটিশুটি হয়ে থাকে।

জামিলা শুধু পঙ্গু নয়, তার শরীরে ধরা পড়েছে মরণব্যাধি ক্যান্সারও। সাত মাস আগে। ডাক্তার বলেছে বেশিদিন বাঁচবে না জামিলা। সাহেবের খুব ইচ্ছা, ওর মাকে কৃত্রিম পা লাগিয়ে হাঁটতে দেখবে; তাহলে মায়ের আর কষ্ট থাকবে না। জামিলার ইচ্ছা ছিল সাহেব যেন স্কুলে যায়, লেখা পড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হয়। স্কুলে যাওয়ার কথা বলতেই সাহেব বলত স্কুলে গেলে ভিক্ষা করব কখন আর ভিক্ষা না করলে খাব কী? পরব কী? আর তোমার ঔষধ খরচই বা দেবো কীভাবে?

সদাইপাতির যে দাম! এই রোদে পুড়ে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করতে ভালো লাগে না। মাস্ক, ক্যালেন্ডার বিক্রি করলে চলে না। ভিক্ষা না করে, চেয়ে না খেয়েও তো উপায় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশনহীন শিক্ষার্থীদের মতো ছোট ছেলেটাও বুঝে ফেলেছে যে, পকেট ভরা থাকলে মাথা হালকা হয়।

পেটে ক্ষুধা আর মাথাভর্তি দুশ্চিন্তা নিয়ে সাহেব ওর মাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মা, রাজশাহী শহরটা কী সুন্দর তাই না! রাস্তায় সুন্দর বাতি, সুন্দর ফুল, এত সৌন্দর্যের মাঝে আমাদের জীবনটাও তো সুন্দর হতে পারত; কেন সুন্দর হলো না, মা?'

তখন মা বলে, কে বলেছে জীবন সুন্দর হয়নি! আল্লাহ তাআলা যে জীবন ভালো মনে করেছেন, সে জীবনই দিয়েছেন। আমাদের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর এই সুন্দর শহরে তুইও তো সুন্দর, সাহেবদের মতো সুন্দর। তাইতো তোর নাম সাহেব রেখেছি।

যারা বলে টাকা সুখ কিনতে পারে না তারা এই কথাটা সাহেবের মতো

পথশিশুদের সামনে বলে দেখুক, বিধাব-অসহায় জামিলার সামনে বলে দেখুক, এসব কথা তারা হেসেই উড়িয়ে দেবে। যদি টাকা থাকতো, তাহলে সাহেব স্কুলে যেতে পারতো, জামিলা কৃত্রিম পা লাগিয়ে হাঁটতে পারতো, এদের ফুটপাতে রাত কাটাতে হতো না, ভিক্ষা করতে হতো না, বৃষ্টিতে ভিজতে হতো না, শীতের রাতে কাঁপতে হতো না।

কিন্তু যেদিন মা-ছেলে মিলে ৩০০ টাকা পায়, সেদিন সাহেব খুব খুশি হয়, যেন পৃথিবীর সেরা সুখী। কারণ কৃত্রিম পা লাগানোর জন্য প্রতিদিন ৫০ টাকা গোছায় সে। কখনো পেটের তাগিদে গোছানো টাকা ফুরিয়ে ফেললেও এ যাবৎ ২,০০০ টাকা গুছিয়েছে সে। দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞানহীন ছেলেটা জানেই না যে, কৃত্রিম পা লাগাতে ৮০-৯০ হাজার টাকা খরচ হয়। ক্যান্সারের কারণে জামিলার মারা যাওয়ার আগেই যেন জামিলা হাঁটতে পারে, এটাই প্রাণপণ চাওয়া সাহেবের। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে রোজ সাহেবের সাথে দেখা হতো আর সেই সূত্রেই সাহেবের মুখে এসব শুনেছি। অল্প সময়ের মধ্যে সাহেবের পক্ষে তাড়াতাড়ি ৮০-৯০ হাজার টাকা গোছানো অসম্ভব, কারণ তার মায়ের হাতে বেশি দিন সময় নেই।

শুনেছিলাম ফরজ কাজ পালনের পর মানুষকে সাহায্য করলে নাকি আল্লাহ সব থেকে বেশি খুশি হন, তাই আমিসহ কয়েকজন বান্ধবী মিলে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে গিয়ে গিয়ে এক সপ্তাহের ব্যবধানে ৮২ হাজার টাকা সংগ্রহ করি। এই খবর সাহেবকে দিতেই ও আনন্দে আটখানা হয়ে লাফাতে থাকে। খবরটা জামিলাকে জানাতে ওদের ঘরে যেতেই দেখি জামিলার নিথর শরীর মেঝেতে পড়ে আছে। সাহেব বুঝে ওঠার আগেই বুঝে গেলাম যে, সে আর বেঁচে নেই। তার সাথে বেঁচে নেই সাহেবের অবশিষ্ট সুখটুকুনও।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জীবনকে ভালোবাসি, একথা আমরা সবাই বলি। অথচ তুচ্ছ কাজে আমরা জীবনের অপচয় করি। বুঝতে তো হবে, জীবনের প্রতি ভালোবাসার দাবী কী!

একটি প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার

{গল্প}

★ জুবায়ের আহমেদ

সুখময় এক রাজ্যের রাজা একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। সেখানে সে রাজ্যের নানান পেশার, নানান বয়সি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার নিয়ম ছিল খুবই সহজ—সবাইকে একটি সাদা গোল বস্তু দেওয়া হবে, তবে শর্ত হচ্ছে, সেটিকে সবসময় নিজের কাছে যথাযথভাবে রাখতে হবে। অর্থাৎ সেই সাদা বস্তুতে ময়লা লাগানো যাবে না। সে রাজ্যের রাজপ্রহরীরা যখন যাকে ইচ্ছে রাজার হুকুমে রাজ্যে নিয়ে আসতে পারবে এবং সেই সাদা বস্তুর অবস্থা নির্ণয় করতে পারবে—সেটি কি সম্পূর্ণ সাদা রয়েছে, না-কি ময়লা লেগে কালো হয়ে গিয়েছে। পুরস্কার হিসাবে রাজা ঘোষণা দিয়েছেন, কোনো ব্যক্তিকে রাজপ্রহরীরা ধরার সময় যদি বস্তুটি সাদাই নিয়ে আসতে পারে, তাহলে তাকে রাজপ্রাসাদের একটি বিশাল কক্ষ দেওয়া হবে। সেখানে চমকপ্রদ
নানান খাবার ও আসবাবপত্র তো থাকবেই, সাথে আরও কত কী থাকবে! যা সে সবসময় ভোগ করতে পারবে। আর যদি সেই বস্তুটি কেউ সাদা নিয়ে না আনতে পারে, যে যেমন

নিয়ে আসবে ২০%, ৪০%, ৬০%, ৮০% কিংবা ১০০% ময়লা তথা কালো হয়ে গেলে তাকে সে অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে।

তাদের রাখা হবে কয়েদখানায়, সেখানে তাদের খাবার দেওয়া হবে রাজপ্রাসাদের লোকদের খাবারের পর তাদের ফেলে দেওয়া গোস্তের হাড়, মাছের কাটা, ফলের অবশিষ্ট বিচি, পানিরও নেই কোনো ব্যবস্থা। সবাইকেই দুটি অপশন দেওয়া হয়েছে। সবাই যদি সেই সাদা বস্তুটি সাদাই নিয়ে আসতে পারে, তাহলে সবাইকে রাজপ্রাসাদে জায়গা দেওয়া হবে, তাতে রাজার কোনো সমস্যা নাই।

সবাই সাদা বস্তু নিয়ে চলে যাচ্ছে, এর মাঝে কয়েকজনকে রাজপ্রহরী ধরে নিলো এবং তাদেরকে দেওয়া হলো রাজপ্রাসাদের কক্ষ। এবং এর মাঝে একজন সাদা বস্তুকে হাত থেকে ফেলে দিয়ে বস্তুটি কালো বানিয়ে ফেলল, তাকেও রাজপ্রহরী ধরে নিক্ষেপ করল কয়েদখানায়। একে একে সবাই নিজ বাসস্থানে চলে গেল। অনেকে রাজপ্রসাদে থাকার লক্ষ্যে সাদা বস্তুকে পরম মমতায় আগলে রাখে। কারও কারও সাদা বস্তুতে অল্প অল্প ময়লা জমতে থাকে। কেউ কেউ তো আবার সাদা বস্তুকে অল্প দিনেই কালো বানিয়ে ফেলল। রাজপ্রহরীরা মাঝে মাঝেই অনেককে নিয়ে যাচ্ছে, সাদা বস্তুর অবস্থা দেখে কাউকে দিচ্ছে রাজপ্রাসাদের কক্ষ আবার কাউকে দিচ্ছে কয়েদখানায়। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছে। একদিন হঠাৎ সবাইকে রাজা ডেকে পাঠায়। সেদিন বিচার করা হয় সবারই। যারা রাজপ্রাসাদের কক্ষ পেয়েছে, তাদের আনন্দ ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ কেউ ভীষণ গরিব ছিল, অথচ এখন সে রাজপ্রাসাদে।

প্রিয় পাঠক, গল্পটি থেকে আমরা কী ম্যাসেজ পেলাম?

রাজপ্রাসাদে থাকার কথা শুনে অনেকেই সাদা বস্তুকে চেষ্টা করেছে সাদাই রাখার জন্য। কেউ হয়তো ব্যর্থ হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কলবকে সাদা অবস্থায়ই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। কলব সাদা নিয়েই যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে এর পুরস্কার জান্নাত। তা জানার পরও গুনাহ দিয়ে কলবকে কালো বানিয়ে ফেলছি। এই কালো কলবে জান্নাতের আশা করা যায়?

কালো কলবকে পরিষ্কার করার এক সুবর্ণ সুযোগ এসেছে মাহে রমজান। রমজানের রহমত দিয়ে ধুয়ে সাদা করা যাবে নিকোষ কালো কলব। যদি তা করা যায়, তবে পরকালে পুরস্কার জান্নাত। যে জান্নাতের নিয়ামত কখনোই ফুরাবে না।

লেখক ও গবেষক

ওজু করি, নামাজ পড়ি

মেহেরুন ইসলাম

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সূর্যটাও ডুবুডুবু। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে সূর্যের লালিমাটুকুও। ছেলে-মেয়েরা যেন খেলার মাঠ ছাড়তেই চাইছে না। কী এক মায়ায় আটকে আছে! এদিকে মায়েদের ব্যস্ততা। গৃহস্থ বাড়ির হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল নিজ নিজ ঘরে উঠানোর তাড়া।

মাগরিবের আজান হচ্ছে। তুবা মায়ের পিছু-পিছু ছুটছে। মায়ের কাজে সাহায্য করতে চাইছে। কিন্তু ছোট হওয়াতে মা করতে দিচ্ছেন না। তার সাথে কথাও বলছেন না। তুবার ভাই তাকরিম এখনো ঘরে ফেরেনি। তাই মা রেগে আছেন।

মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে তাকরিম আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলো। তবে সে তুবার চোখ এড়াতে পারেনি।

—আম্মু, আম্মু, ভাইয়া এসেছেন।

তুবার কথায় আম্মু সাড়া দিলেন

—ওকে ওজু করে নামায আদায় করতে বলো।

ইতিমধ্যে তাকরিম ওজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেছে।

তুবা তা দেখে মায়ের কাছে ফিরে এসেছে। মা নামাজের জন্য তৈরি হচ্ছেন, ওজু নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আম্মু, আমিও তোমার সাথে নামাজ আদায় করব। মা কোনো সাড়া দেয়নি। তবুও তুবা মাকে অনুসরণ করে ওজু করছে। কিন্তু তার ওজু ঠিকঠাক হচ্ছে না। এটি মা খেয়াল করেছেন।

—তুবা, তোমার ওজু সঠিক হয়নি।

মায়ের কথায় তুবার মন খারাপ হয়ে গেল।

—মন খারাপ করো না মামণি। আমি নামাজ আদায় শেষে তোমাকে ওজু শিখিয়ে দেবো, ইনশাআল্লাহ।

মা নামাজ শেষে তুবাকে ওজু শেখাতে লাগলেন।

তোমার ওজুতে বেশি ভুল হয়নি। তবে কিছু ফরজ রোকন বাদ পড়ে গেছে। আর ফরজ বাদ পড়লে ওজু শুদ্ধ হয় না।

—ওজুর ফরজ কয়টি আম্মু?

—ওজুর ফরজ চারটি।

১. সমস্ত মুখ ভালোভাবে ধোয়া। ২. দুই হাতের কনুইসহ ভালোভাবে ধোয়া। ৩. মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা। ৪. দুই পায়ের টাকনুসহ ভালোভাবে ধোয়া।

—আম্মু, আমি এবার ভুলটা খুঁজে পেয়েছি।

— তাহলে বলো দেখি কী ভুল ছিল?

— আমি তাড়াহুড়ো করে ভালোভাবে হাত-পা ধুইনি, অল্প পানিতে আমার কনুই ও টাকনু ভেজেনি।

—মাশাআল্লাহ, আমার মামণি সহজেই বুঝতে পেরেছে।

এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক করতে কোরআনেও বলা হয়েছে—

‘*হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নমাজের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন তোমাদের মুখ-মণ্ডল ও দুই হাত কনুইসহ ধৌত করো আর তোমাদের মাথা (চার ভাগের এক ভাগ) মাসেহ করো। দুই পা টাকনুসহ ধৌত করো।*’ (সুরা আল-মায়েদাহ, আয়াত : ৭)

—আম্মু, আমার আর ভুল হবে না, ইনশাআল্লাহ।

—ওজু শেষে আরেকটি কাজ আছে, তা কি জানো?

—না, আম্মু।

—ওজু শেষে কালেমা শাহাদাত পড়া মুস্তাহাব।

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওজু করার পর ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু’ বলবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।’ (সহিহ মুসলিম : ১/১২২)

সুবহানাআল্লাহ। আমি গতকালও মক্তবে এই কালেমা পড়েছি। এবার হুজুরের কাছ থেকে সুন্দর করে শিখে নেব, ইনশাআল্লাহ।

তাকরিমও এতক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মায়ের কথা শুনেছে। আম্মু, আমিও তোমার সব কথা শুনেছি। আজ থেকে আমিও আর কালেমা শাহাদাত পড়তে ভুলব না, ইনশাআল্লাহ। তাকরিমের কথায় মায়ের নয়নযুগল খুশির অশ্রুতে সিক্ত হলো।

মন বলে প্রতিটি মাকে বলি, ছোট্ট থেকেই সন্তানদের এভাবে গড়ে তুলুন, ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করুন। অন্যথায় এমন সময় আসবে যে, এই আদরের সন্তানই তাঁর মাকে চিনবে না। হে রব্বুল আলামিন, আমার ছেলেমেয়েকে দ্বীনের পথে কবুল করে নাও। আমিন।

সিনিয়র স্টাফ নার্স, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।

ভগ্নহৃদয়ে যার বাস

✷ নিলুফা মল্লিক

ঝরাপাতা মর্মর শব্দে বাতাসের দোলায় আওয়াজ তুলছে। অগোছালো পায়ে বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ি মাটিতে। ছলছল চোখে তাকিয়ে ছিলাম, দুটো চড়ুই কিচিরমিচির করছে গাছের ডালে। তারা তাদের ভাষায় কী যেন বলল পরস্পরে। হঠাৎ খুব দ্রুত একটি পাখি উড়ে চলে গেল আমার মাথার উপর দিয়ে। এখানেই কোথাও তারা বাসা বেঁধেছে। আমাদের জীর্ণ কুটিরে ঘাসের রাজকীয় প্রাসাদ দেখে

অগোছালো বিক্ষিপ্ত পা ফেলে গেলাম কলপাড়ে। ওজু সেরে ঢকঢক করে পানি পান করলাম। শাহাদাত পাঠ করতে করতে চলে এলাম ঘরে। বৃদ্ধ মা ডাক দিয়ে বললেন—আফরা, কিরে কিছু হয়েছে? তোকে কেমন চঞ্চল দেখাচ্ছে।

কিঞ্চিত হাসলাম। ছানা ফুটিয়েছে হয়তো। ওখান থেকে মায়াভরা সুরে কিচিরমিচির মিষ্টি আওয়াজ ভেসে আসছে। চড়ুইয়ের ছোট্ট সংসার, ছোট্ট ছোট্ট ছানা। তাদের জীবনটা কত্ত সুন্দর। অথচ এই আমাদের মানুষদের কত জটিলতা ভরপুর। কত হাসি কান্নার গল্প। কত আড়াল অন্তরাল রয়েছে এই মানুষদের।

ভাবতে ভাবতেই ওপার থেকে ভেসে আসছে আসরের আজান—হাইয়া আলাল ফালাহ; এসো কল্যাণের দিকে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলটুকু দ্রুত মুছে নিলাম হাতের পিঠ দিয়ে। কাঁদছি কেন আমি! এই তো মুয়াজ্জিন ঘোষণা করল নামাজে কল্যাণ। আমার কল্যাণের প্রয়োজন। জীবন যেভাবে জটিলতায় ভরে যাচ্ছে, আর তো সুযোগ দেওয়া যায় না এ-সবকে। এড়িয়ে গিয়ে কুড়িয়ে নিতে হবে সুষমতা। চেয়ে নিতে হবে কল্যাণ।

ভেতরের চাপা দীর্ঘশ্বাস খুব গোপনে ছেড়ে অস্ফুটে বললাম, নাহ। প্রস্থান করলাম দ্রুত সেখান থেকে। মায়েরা সত্যিই দারুণ অভিজ্ঞ সন্তানদের সম্পর্কে। কী করে যেন সব বুঝে ফেলেন।

সত্যিই তো আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে কল্যাণের পিপাসায়। আজ কল্যাণ চেয়ে নেব রাব্বে কারিমের কাছ থেকে। আসরের নামাজ শেষ করে, সিজদায় লুটিয়ে হৃদয়ের সব অপ্রাপ্তির বেদনা চোখের জলে বের করে দিলাম। কিছুক্ষণ পর শান্ত মন ও মস্তিষ্ক নিয়ে নাদিয়া কুরআন শরীফ উল্টে সুরা নাবায় থামল

মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো। মনের সবটুকু মাধুরী মিশিয়ে তিলাওয়াত করলাম। তিলাওয়াত শেষে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। খানিকটা সময় আমাদের রিজিকের একমাত্র সোপান সেলাই মেশিনটার দিকে তাকালাম। বাম হাতে স্পর্শ করে আওড়ালাম আল্লাহ তোমাকে সুস্থতার সহিত দীর্ঘজীবী করুন।

মনে পড়ে মা মাঝে মাঝেই আমার শুকনো মুখ দেখে আর অনুযোগ শুনে বলতেন, চিন্তা করিস না। ভগ্নহৃদয়েই আল্লাহ থাকেন। সত্যিই এটা আমি অনুধাবন করতে পেরেছি। যখনই আমার হৃদয় বিষণ্নতায় ছেয়ে যায়, অন্তরমহলে ভাঙচুর হয়। ঠিক তখনই ইবাদতের প্রতি টান অনুভব হয়। আমি বারবার উপলব্ধি করেছি ভগ্নহৃদয় তখনই প্রশান্ত হয়, যখন মাথার সাথে মনটাও সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। যখন অস্থিরতায় নিমজ্জিত হয়ে রবকে ডাকে, তখনই প্রশান্ত হয়। মাঝে মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা অস্থিরতায় নিমজ্জিত করেন, তাঁর দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। মাঝেমধ্যে বিষণ্নতায় হৃদয় ভাঙেন, তাতে আবাস গড়ার জন্য।

(সুনামগঞ্জ)

" জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতে, আবেগ ও ক্রোধ যারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, শান্ত মস্তিস্কে যারা কল্যাণ-অকল্যাণ চিন্তা করতে পারে, তারপর দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, সফলতা তাদেরই জন্য। "

এক টুকরো স্বাধীনতা

ফয়সাল হাসান শুভ্র

{গল্প}

ধীরে ধীরে নৌকার গলুই থেকে বেরিয়ে এলো শাহীন। নিস্তব্ধ রাত, আকাশে পূর্ণ চাঁদের হাসি, মাঝে মাঝে ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ; সবমিলিয়ে মনোরম পরিবেশ চারদিকে। হঠাৎ দূরে কোথাও দুম দুম করে বন্দুকের শব্দে চারপাশের নিস্তব্ধতাকে বিষিয়ে তুলল। চমকে উঠল শাহীন। হয়তো এই মুহূর্তে কোনো মায়ের বুক খালি করে দিয়েছে পাকিস্তানি বাহিনী। নয়তো কেড়ে নিয়েছে কারও মাথার উপরের ছায়া একমাত্র সম্বল বাবাকে।

হঠাৎ বাবার কথা খুব মনে পড়ল শাহীনের। তার বাবা ছিল গ্রামের ডাকপিয়ন। চিঠির পাশাপাশি পাক-বাহিনীর গতিবিধির খবর ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতো তার বাবা। একদিন কীভাবে যেন রাজাকাররা এই খবর পেয়ে যায়। তারপর একদিন বাড়ি থেকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায় তার বাবাকে। বাজারের শেষে বড় পুকুরটার পাড়ে জামগাছের সাথে বেঁধে তাকে গুলি করে হত্যা করে।

সেদিন তার বাবার রক্তে লাল হয়ে গেছিল পুকুরের পানি। এর কিছুদিন পরেই সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় অবশ্য অঝোরে কেঁদেছিল তার মা। বারবার তার যাওয়ার পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু শাহীন অনড়। সে তার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবেই। অনেক কষ্টে মাকে বুঝিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে।

ভাবতে ভাবতে চোখ মুছলো শাহীন। নদীর দিক থেকে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া আসছে। এখন প্রায় মধ্যরাত; নৌকার ভেতরে সহযোদ্ধারা ঘুমাচ্ছে। কাল রাণীগঞ্জে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্পে অপারেশন চালাতে হবে। সেখানে পৌঁছানোর আগে তারা আরেকটা দলের সাথে মিলিত হবে, তারপর একসাথে আক্রমণ চালাবে। এসময় হাসান এলো ভেতর থেকে।

—কী ব্যাপার শাহীন! তুমি এখনো ঘুমাওনি?

—ঘুম আসছে না হাসান ভাই, ভালো লাগছে না।

হাসান একটু ম্লান হেসে বলল,
—শোনো শাহীন, কালকের অপারেশনটা অনেক জরুরি। এটা সফল হলে এই এলাকা সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই এখন রেস্ট নাও, কাল অনেক পরিশ্রম করতে হবে।
বাধ্যগত ছাত্রের মতো মেনে নেয় শাহীন।
—ঠিক আছে হাসান ভাই,

আপনিও শুয়ে পড়েন।
পরদিন ভোর।
সবেমাত্র রক্তিম সূর্যটা নীল আকাশের বুক চিরে উঠেছে। শাহিন ও তার সাথিরা তৈরি হলো। অন্য দলটাও এসে পড়েছে। সবাই হালকা নাস্তা সেরে রওনা দিলো রাণীগঞ্জ ক্যাম্পের দিকে। ক্যাম্পের কাছে পৌঁছেই হাসান দলকে তিন ভাগ করে তিনদিকে পাঠিয়ে দিলো, আর সে এবং আরও দুজন রইলো সামনে। তাদের কাজ সামনে থেকে গুলি ছুঁড়ে পাক-হানাদারদের বিভ্রান্ত করা। আর মূল আক্রমণ চালাবে বাকি তিন দল। শাহীনের দায়িত্ব পড়লো এক দলকে নেতৃত্ব দেওয়া। সবাই পজিশন নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইল। এমন সময় বিভ্রান্তকারী দল প্রথম গুলি ছুঁড়ল। আর তাতেই পাকিস্তানি বাহিনীর সবাই ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে লাগল। সেই সুযোগে বাকি তিন দল প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল। পাকিস্তানি বাহিনী কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের ধরাশায়ী করে ফেলল। প্রচণ্ড গোলাগুলি চলতে লাগল। বিজয় প্রায় শাহীনদের পক্ষেই চলে আসছিল হঠাৎ যুদ্ধের পাশ উলটে গেল। ঘাঁটির পেছনে সারি সারি মাইন পোঁতা ছিল আর তার কবলে পড়ল পেছন দিক থেকে আক্রমণ করা দল। প্রচণ্ড শব্দে মাইন বিস্ফোরিত হলো পটাপট ঝরে পড়ল তাজা প্রাণ। আর তা দেখে পাকিস্তানি বাহিনী যেন প্রাণ ফিরে পেল। তারা আরও পূর্ণ উদ্যমে আক্রমণ চালাতে লাগল। আর ওইদিকে সাথিদের হারিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা যেন অসহায় হয়ে পড়ল। একের পর এক প্রাণ ঝরে পড়তে লাগল।

শাহীন কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। এই ঘাঁটি হাতছাড়া হয়ে গেলে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। এমন সময় তার পকেটে থাকা গ্রেনেডটির কথা মনে পড়ল। আসার পথে হাসান ভাই তাকে দিয়েছিল।
শাহীন গ্রেনেডটি হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে
এগুতে লাগল। দূর থেকে গ্রেনেড ছুড়লে কোনো লাভ হবে না, কাছ থেকে ছুড়তে হবে। এমন সময় একটি বুলেট এসে

বিঁধল তার ডান হাতে। হাতটি প্রায় অকেজো হয়ে গেল, বন্দুক ছেড়ে গ্রেনেড তুলে নিল বাম হাতে নিয়েই ছুটতে লাগল তাদের ঘাঁটির সামনে। এমন সময় আরেকটি বুলেট এসে লাগল বাম হাতে, কুঁকিয়ে উঠল শাহীন; তবুও সে ছুটছে। মুখ দিয়ে গ্রেনেডের রিংটা খুলে ফেলল, হাত দিয়ে গ্রেনেড ছোড়ার শক্তি নেই।
অবশ হয়ে যাওয়া হাতে গ্রেনেডটি নিয়ে একছুটে চলে এলো পাকবাহিনীর ঘাঁটিতে। এমন সময় চতুর্দিক
থেকে প্রায় ছয়টা বুলেট এসে বিঁধল তার বুকে-পিঠে। আর সাথে সাথেই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে গেল গ্রেনেড।সাথে সাথেই উড়ে গেল পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প আর সাথে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলশাহীনের দেহ।
এর বিনিময়ে শত্রু মুক্ত হলো আরেকটি অঞ্চল। অর্জিত হলো একটুকরো স্বাধীনতা। এরকম হাজারো শাহীন আছে, যাদের ত্যাগের বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমাদের উচিত বিশেষ দিবসে তাঁদের স্মরণ না করে সর্বদা তাঁদের স্মরণে রাখা। দেশের জন্য তাঁদের যেই উদ্দেশ্য ছিল, তা বহাল রাখা। তবেই তাঁদের আত্মত্যাগের মর্যাদা রক্ষা করা হবে।

রায়পুর, লক্ষ্মীপুর

তোমার বুকের রক্ত যদি জাতির জীবনে রক্ত রক্ষা করে। তোমার মৃত্যু ও জীবনদান যদি জাতিকে বেঁচে থাকার পথ দেখাতে পারে, তাহলে মৃত্যুতেও তুমি অমর। {আবু তাহের মিছবাহ}

শ্বশুরবাড়ির ইফতার

● **শেখ সজীব আহমেদ**

মেয়েটির নাম মালা। গরিব ঘরের মেয়ে। তার বিয়ে ঠিক হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র ছেলে রাশেদের সাথে। বিয়ের যৌতুক নিয়ে রাশেদের বাবা মালার বাবার সঙ্গে কথা বলেছেন। মালার বাবা সম্পূর্ণ যৌতুক আজ দিতে পারবেন না, তাই মালার বিয়েটা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। বিয়ের সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে অবশিষ্ট যৌতুকের দেনা-পাওনা বুঝিয়ে দেবেন বলে জানালেন মালার বাবা।

রাশেদের ইচ্ছে ছিল যৌতুক ছাড়া বিয়ে করবে। কিন্তু তার লোভিত মা-বাবার কারণে তা আর পারল কোথায়! অবশেষে বিয়ে হলো। কিছুদিন ভালোই গেল। এরপর; মালার শ্বশুর-শাশুড়ি নির্যাতন শুরু করে দিলো অবশিষ্ট যৌতুকের জন্যে।

রাশেদ বিশেষ কাজে ঢাকায় গেছে। মালা তার স্বামীর কাছে নির্যাতনের কথা বলতে পারেনি। ফোন করে বাবার কাছে বলল। মালার বাবা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অনেকের কাছে টাকা ধারও চাইলেন, কিন্তু পেলেন না। অবশেষে পালিত গরু দুটি বিক্রি করে অবশিষ্ট যৌতুক দিয়ে দিলেন। এর কিছুদিন পরই এলো রমজান মাস। কয়েকটা রোজা চলেও গেল। রাশেদ বাড়িতেই আছে। মালাকে শুনিয়ে রাশেদের মা বলছেন—

'পোলাডারে এমন গরিব মাইয়া বিয়া করায়া আনছি, রোজা-রমজানের দিনে ইফতারি পাঠানোর কোনো খবর নাই।'

মালা জবাব দিলো—

'আপনারা কেউ রোজা রাখেন না, ইফতারি দিয়া কী করবেন?

রাশেদের বাবা বললেন—

'এত কথা কও ক্যান? ছোটলোকের বড় কথা কথা কইতে নাই।'

রাশেদের মা বললেন—

'আমরা কেউ রোজা রাখি না রাখি, আমার পোলাটা তো রোজা রাখে না-কি?'

রাশেদ কথাটা শুনে বলল—

'আপনারা তো জানেন, আমার শ্বশুরবাড়ির কী অবস্থা। ওই বাড়ির কোনোকিছুর প্রতি আমার লোভ নাই। ইফতারির আশা করমু ক্যান? আমি আরও শ্বশুরবাড়িতে যামু ইফতারি নিয়া।'

রাশেদের মা অবাক হয়ে বললেন—

'পোলায় কয় কী! তোর বাপরে জিগা, আমার বাপের বাড়ি থ্যাইকা কতকিছু আনছে। পুরা রমজান আমার বাপের টাকার ইফতারি দিয়াই তো চলতো। আইজ তোর নানায় বাঁইচ্চা থাকলে বুঝতে পারতি, ইফতারি কত রকমের, ইফতারি খাওয়া কারে কয়। বিশ্বাস না করলে, তোর বাপরে জিগা।'

রাশেদের বাবা বললেন—

'রাশেদেরে রোজার পরে আরেকটা বিয়া করামু, পোলার ওই শ্বশুরবাড়ি থ্যাইকা যা দেওয়ার তা তো দিবই; রমজান আইলে ইফতারির কথা কইতেও হইব না, প্রথম রোজাই ইফতারি হাজির থাকব।'

রাশেদ তার বাবাকে বলল—

'আব্বা, আপনে এসব কী কইতাছেন, আপনার মাথা ঠিক আছে?'

এভাবে কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক চলল। অবশেষে মালা কান্নামুখে আড়ালে চলে আসে। তার বাবার কাছে মোবাইল করে ইফতার আনার কথা বলে। তিনি দুয়েক

দিনের মধ্যে ইফতার নিয়ে আসবে বলে জানালেন। মালার বাবা চিন্তায় পড়ে গেলেন। এখন ইফতার কেনার টাকা পাবেন কোথায়? গরু দুটো ছিল, তাও বিক্রি করে ফেলেছেন। ছোট্ট একটা বাছুর ছিল,

পাওনাদার বাছুরটাও নিয়ে গেছে। গরিব বলে কেউ ধারও দেয় না। রেহেনার মা অনেক আগেই মারা গেছেন।

রেহেনার মায়ের কিছু শাড়ি-কাপড় ছিল, তার বাবা তা বিক্রি করে দিলেন; স্বল্প দামে। কিছু জাকাতের টাকাও ছিল। সব নিয়ে মালার বাবা বাজার থেকে প্রায় তিন হাজার টাকার ইফতার

কিনে মালার শ্বশুরবাড়ি আসলেন। মালার শ্বশুর-শাশুড়ি তো এসব দেখে মহাখুশি! মালার বাবাকে খুব আদর-আপ্যায়ন করলেন। ইফতারের সময় ইফতার করালেন। মালার শাশুড়ি মালার বাবার কাছে রাশেদ ব্যবসা করবে বলে কিছু টাকা ধারও চাইলেন।

তার বাবা মনে দুঃখ পেলেও মেয়ের সুখের জন্যে হাসিমুখে কিছু টাকা দেওয়ার জন্যে রাজি হলেন। শেষ পর্যন্ত বসতভিটাটুকুও বিক্রি করতে হবে। মালা এসব দেখে কষ্টে দু'চোখের জল ফেলে। আর নীরবে কাঁদতে থাকে। গরিব ঘরে জন্ম নিলে জ্বালার তো শেষ নেই। গরিব ঘরের মেয়েরা আর কত নির্যাতন ও মানসিক চাপ সহ্য করবে।

তাই আসুন, আমরা এই গল্প থেকে শিক্ষা অর্জন করি—সমাজের এই নিকৃষ্ট প্রথা বর্জন করি।

মালদ্বীপ প্রবাসী

স্মৃতির শার্সিতে মুখচ্ছবি

তাশরীফ আহমদ

সোনারাঙা গোধূলির আলোয় চিকন বাঁকা কাস্তের মতো রোজার চাঁদ নজরে পড়ামাত্রই তার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র সাইরেনের শব্দ। ব্যস, ফারিয়া ও ভাই ফাহিমসহ ঈদ-আনন্দ শুরু হয়ে যায়। প্রতিদিন সাহরি ও ইফতারের আনন্দই আলাদা। ফারিয়াদের পরিবার একান্নবর্তী পরিবার বললে ভুল হবে। আশি বছরের বৃদ্ধ দাদা এরতাজউদ্দিন, পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ দাদি জুলেখা খাতুন, দুই চাচা, তাদের পরিবারসহ সবাই একই হাঁড়িতে খায়। নিজেরা চৌদ্দজন আর দুজন কাজের মানুষ, মোট ষোলো জন।

এই হলো ফারিয়াদের পরিবার। সুতরাং আনন্দের কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না। ভাই-বোনদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে খাওয়া, ইফতারিতে কে বেশি পেল, কে কম পেল তা নিয়ে দাদা বা দাদির কাছে বিচার দেওয়া—এ এক অন্যরকম জীবন। আর চাঁদরাতের কথা তো বলাই বাহুল্য। অর্ধেক রাত জেগে তেমনই মেহেদি লাগানো আর মা-চাচিরা মেহেদি বেটে দিতেন। তাজা পাতা। টকটকে লাল। আগে দিলে লাল কমে যাবে, তাই চাঁদরাতের অপেক্ষা। ফারিয়ারা খুশিতে খই ফোটার মতো ফুটতে থাকত। নির্ঘুম কাটিয়ে দিত সারাটি রাত। ঈদের নতুন জামা সারা মাস লুকিয়ে রাখত। যেন কেউ দেখলেই

জামা পুরাতন হয়ে যাবে, নতুনের মজাই আর থাকবে না। সারারাত বালিশের নিচে ঈদের জামাকাপড় রেখে দিত। ঘুম আসতো না। বারবার উঠে রাতে কতশত বার যে উপহারগুলো দেখত, তার ইয়ত্তা নেই। ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে দে দৌড়। তাড়াতাড়ি গোসল করে আতর-সুরমা মেখে দাদার হাত ধরে ঈদের জামাতে ঈদগাহে নামাজ, নামাজ শেষে কোলাকুলি।

মায়ের হাতের সেমাই, ফিরনি। আহ! কী যে স্বাদ! তারপর সারাদিন গোটা মহল্লা ঘুরে বেড়ানো।

সেদিন আজ কোথায় হারিয়ে গেল! সময় যেন পলকের চাইতেও পলকা। এই আছে, এই নেই। রোজার দিন এলেই ফারিয়ার খুব শিশুবেলার কথা মনে হয়। আজ ফারিয়া নিজেই মধ্যবয়সি। ফারিয়ার নিজের সংসার হয়েছে। স্বামী ফুয়াদ মণ্ডল। পেশায় ডাক্তার। নিজে একটা বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতা করে। একটি মাত্র সন্তান ফারহান মণ্ডল। সুদূর আমেরিকায় স্থায়ী আবাস গেড়েছে। সে পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকান ক্রিশ্চিয়ান বউ। দু'জন নাতি-নাতনি আছে, তবে বছরের পর বছর দেখা নেই। থাকা না থাকার মাঝে কোনো তফাত করতে পারে না ফারিয়া। ওদের জন্য মন কাঁদে কিন্তু কোনো উপায় তো নেই। ফারহানের বা তার পরিবারের কাছে রোজার আলাদা কোনো আবেদন এখন আর নেই। তারা কিছুই করে না, মাঝেমাঝে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে ফেসবুকে ছবি পোস্ট দেয়। অথচ ফারহান উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে সারা মাস রোজা রাখত, বাবার সঙ্গে তারাবির নামাজ পড়ত। সেও এখন একদা এক সময় হয়ে গেছে, কিছুই আর আগের মতো নেই। চিকিৎসক স্বামী সারাদিন হাসপাতাল, তারপর রাত এগারোটা পর্যন্ত চেম্বার করে ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা। তবে রোজার মাসে ইফতারির পর বেশি রাত করে না। ঘরে বাইরে দুজন মানুষ, বাড়িতে একটা ছেলে কাজ করে।

আম্মা আজ ইফতার কী বানামু? রহিমের ডাকে ফারিয়ার চিন্তায় ছেদ পড়ল। সে যেন ফেলে আসা শৈশবে ফিরে গিয়েছিল। আজকাল প্রায়ই এমন হয়। বয়স হচ্ছে বুঝি।

বানা, যা খেতে মন চায়।

আপনি কয়া দেন, আমি হুদাই কী বানামু।

প্রতিদিন যা বানাস, তা-ই বানা বাবা। আজ আমার কিছুই ভালো লাগছে না।

তোর খালুজান আজ বাসায় ইফতার করবে না। রাতের খাবারটা ঠিকমতো করিস। যা এখন।

ফারিয়া, কোলবালিশটা বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে আবার ডুবসাঁতারে হারিয়ে গেল ছোটবেলায়। আহ কী পরম শান্তি! কেন যে মানুষ বড় হয়? বড় হওয়া যে কত যন্ত্রণা। মা যেমন করে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরতেন ঘুমানোর সময়, ফারিয়াও তেমন করে বালিশটাকে আঁকড়ে নিল। বালিশের ভেতর মুখ গুঁজে মায়ের চাঁপা ফুলের মিষ্টি গন্ধ নেবার জন্য লম্বা করে শ্বাস নিল। অনুভবে মায়ের গায়ের গন্ধের চাঁপাবনে হারিয়ে গেল। নিজের অলক্ষে চোখ থেকে গরম নোনা পানি ঝরতে থাকল।

নোনাধরা জীবনের পলেস্তার যেন এই নোনা জলে চুইয়ে চুইয়ে খসে পড়ে বালিশ ভিজিয়ে দিচ্ছে। আম্মা গো... তীক্ষ্ন চিৎকারে বাস্তবে ফিরেই এক দৌড়।

শিক্ষক ও লেখক

ফিলিপাইনে কীভাবে খ্রিষ্টবাদ

জুবায়ের মোল্যা

ইতিহাস হচ্ছে পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ জানার এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এমনসব বিষয়বস্তু লুকিয়ে থাকে, যা সবার সামনে কখনো কখনো ধরা দেয় না। ধরা দিলেও তা নিয়ে ভেবে দেখার সময় হয়তো থাকে না। তেমনই একটুকরো জানা না জানার বিষয় হচ্ছে পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইনে খ্রিষ্ঠবাদ। যা আজকের দিনে এশিয়ার একমাত্র খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু কীভাবে এখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আজ আমরা জানব।

এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় একটি দেশের নাম ফিলিপাইন। যেটিকে আমরা এশিয়ার একমাত্র খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের দেশ বলে চিনি। আদৌ কি তারা খ্রিষ্টান ছিল? এই প্রশ্নটিই আমার মনে অনেক আগেই আসছিল, কারণ খ্রিষ্টান জাতি বেশিরভাগই দেখা যায় ইউরোপ আমেরিকায় কিন্তু এশিয়ায় একটা খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের দেশ কীভাবে গড়ে উঠলো?

প্রথমেই বলে রাখি ফিলিপাইন খ্রিষ্টান ধর্মালম্বীদের দেশ ছিল না। ইতিহাস

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক ফার্ডিনান্ড ম্যাজিলান স্পেনের রাজা পঞ্চম ফিলিপের পৃষ্ঠপোষকতায় সে আমেরিকার অপর পাশ দেখার বাসনা করে। এই যাত্রায় সে স্পেন থেকে আমেরিকার অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। সে প্রথমে ব্রাজিল এসে পৌঁছায়, তারপরে দক্ষিণ আমেরিকার শেষ প্রান্ত দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করে। আর বলে রাখা ভালো আমরা প্রণালি পড়ার সময় ম্যাজিলান প্রণালি পড়ে থাকি, সেটা তারই আবিষ্কার। যাত্রাপথে সে ১৫২১ খ্রিষ্টাব্দে একটি সবুজ শ্যামল এবং খুবই আকর্ষণীয় দ্বীপ দেখতে পায়। যেটা ছিল মূলত ফিলিপাইন। আর ফিলিপাইনের নাম রাখা হয় রাজা পঞ্চম ফিলিপের নাম অনুসারে। ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, সে সময়ের ফিলিপাইনের জনগণ প্রায় সবাই মুসলিম ছিল। বলে রাখা ভালো ফিলিপাইনে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে আরব বণিকরা খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকে। আর তারা আরব বণিকদের ব্যবহার, কথাবার্তা, কাজকর্ম এবং দাওয়াত ও তাবলিগে প্রভাবিত হয়ে ইসলামকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেয়। এর আগে তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করতো।

কিন্তু ফার্ডিনান্ড সেখানে যাওয়ার পর রক্তপাত শুরু করে দেয়। আর ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নেয়। পরবর্তী সময়ে সে স্পেনে ফিরে গিয়ে ফিলিপাইনে স্পানিশ সেনা মোতায়েন করে। তখন মুসলমানদের ছিল ওসমানীয় খেলাফত। আর ওসমানীয় খেলাফত ফিলিপাইন থেকে অনেক দূরবর্তী হওয়ায় এখানে তেমন খেলাফতের কোনো কার্যক্রম শক্তিশালী ছিল না। যার দরুন তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা শুরু করে। আর পশ্চিমাদের সামরিক অস্ত্র, গোলাবারুদ এগুলো নিরিহ ফিলিপাইনের মুসলমানদের কাছে নতুন ছিল। যার দরুন তারা যুদ্ধে ভীত ছিল। সেই সময়টায় ফিলিপাইনে মহামারির প্রাদুর্ভাব ছিল, যার কারণে ফিলিপাইনের জনগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। পরবর্তী সময়ে ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিপাইনের উপকূল দখল করে নেয় স্প্যানিশরা। এতে করে পশ্চিমারা নিরীহ ফিলিপাইন মুসলমানদেরকে জোরপূর্বক খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে শুরু করে। তারা সেখানে মিশনারি অর্থাৎ খৃষ্টবাদের দাওয়াত দিতে শুরু করে। আর যারা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হতে অস্বীকার করে, তাদেরকে তারা হত্যা করে। এভাবে

তারা প্রায়ই ফিলিপাইনের অর্ধ শতাংশ মুসলিমকে হত্যা করে। তারপর তারা ফিলিপাইন থেকে ধন সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। পরে পশ্চিমা স্পেন ফিলিপাইনে তাদের কলোনিয়াল শাসন শুরু করে।

এভাবেই একটা মুসলিম দেশ খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী দেশে পরিণত হয়। বর্তমানে ফিলিপাইনে প্রায় ৭০ ভাগের বেশি জনগণ খ্রিষ্টান আর ৩০ ভাগের মতো মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

তথ্যসূত্রঃ১.https://www.britannica.com/topic/history-of-Philippines
২.https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_the_Philippines#%3A%7E%3Atext%3DAfter_Magellan_was_killed_by%2Cin_the_Philippines_took_place.?wprov=sfla1
৩. বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত, মাওলানা ইসমাইল রেহান; অনুবাদঃ নাশাত পাবলিকেশন

অতীতের সাক্ষী, সত্যের আলো, জীবন্ত স্মৃতি, জীবনের শিক্ষা ও প্রাচীনত্বের বার্তাবাহক হলো ইতিহাস। ≫ সিচেরো

রক্তনদী

আবরার নাঈম

আমরা আছি মহাসুখে সবাই মিলেমিশে,
গাজা কেন রণক্ষেত্র দোষটা ওদের কীসে।
কত অবুঝ শিশু দেখ জন্ম হওয়ার পর,
পায়নি মায়ের দুধের স্বাদ ও ছোট্ট কুঁড়েঘর।

বুলেট বিঁধে কোমল বক্ষে রক্ত নদী বয়,
মায়ের সামনে সন্তানের লাশ কেমনে বলো সয়।
অশ্রুনদী শুকিয়ে গেছে স্বজন হারার শোকে,
একটুখানি হাসির রেখা নেই তো ওদের মুখে।

হায়েনাবাদী ইহুদিদের না থামালে তবে,
ওদের হাতে দুনিয়াটা জাহান্নামই হবে।
সময় থাকতে রুখো তাদের চেপে ধর টুঁটি,
দাও পাঠিয়ে জাহান্নামে একেবারে ছুটি।

মুক্ত খাঁচা

আব্দুল আহাদ

ওই আকাশে মুক্ত খাঁচায়
উড়ছে কত পাখি,
কোয়েল-ময়না-ঘুঘু-টিয়া
কেন বন্দি রাখি?

সবার মনে ইচ্ছা জাগে
মুক্ত হয়ে উড়ি,
ডালে-ডালে, পাতায়
শাখে ইচ্ছেমতো ঘুরি।

বন্দি দুয়ার দাও খুলে
দাও সকল পাখির তরে,
মুক্ত হয়ে আপন মতে
সবাই যেন চড়ে।

যদি ভাগ্য জোটে

মুহিত ইসলাম

নিষুপ্ত পূর্ণিমা তোমার ঘরে,
তখন আমার সন্ধ্যাবেলা;
বাতায়ন ফাঁকে আঁখি তুলে,
দেখছি কেবল তারার মেলা।

ঝলসানো এই তারার মেলায়,
তোমায় ভীষণ লাগছে গাঢ়;
তোমার মায়ায় কেন জড়ায়,
তুমি কি তা বলতে পারো।

ভীষণ প্রিয় মুখটি তোমার,
দেখলেই যেন মায়া বাড়ে;
শত চাওয়ায় যায় না ভোলা,
মন ছুটে যায় তোমার ধারে।

তোমার জন্য হৃদয়-পাঁজর,
থাকবে খোলা ভরদুপুরে;
সন্ধ্যা হলে চাঁদের আলোয়,
এসো প্রিয় আমার ঘরে।

একলা হলে ডেকো আমায়,
শত বাধায় আসবো ছুটে;
তুমি আমার হৃদ প্রেয়সী,
যদি আমার ভাগ্যে জোটে।

মানবিক মানুষ

মুহাম্মদ মুকুল মিয়া

এমন একটা সময় এখন
ভালো মানুষ কম,
মানুষ নামের অমানুষের
ভেতর ভরা যম।

মুখে বলে ভালো কথা
অন্তরেতে বিষ,
পরের ক্ষতি করেই ওরা
যাচ্ছে অহর্নিশ।

উপকারের নামে ওরা
ধরে একটা ভাব,
সত্যিকারের মানুষগুলোর
বড়োই যে অভাব।

পরের মুখে হাসি আনতে
করে যারা কাজ,
হাল জামানার তারাই হলো
আসল মহারাজ।

সময়

হা. ক্বারী মঈন উদ্দিন

সময় গেলে আসে না আর
এটাই বাস্তবতা,
তাই তো আমরা সময় নষ্ট
করব না অযথা।

সময়টাকে বেশি করে
মূল্য দেবে যারা,
সব কিছুতেই তৃপ্তি পাবে
সফল হবে তারা।

সময়ের কাজ অসময়ে
আমরা করে থাকি,
সময়কে নয় নিজেকে নিজে
দিচ্ছি যেন ফাঁকি।

সময় থাকতে এসো সবাই
ভালো আমল করি,
হেলায় খেলায় সময় যাতে
নষ্ট নাহি করি।

ফাগুনে আগুন ছড়ায়

চিত্তরঞ্জন সাহা

ফাগুন এলে আগুন ছড়ায়
বুকের মাঝে,
রঙে রঙে শহিদ মিনার
তাইতো সাজে।
খালি পায়ে প্রভাতফেরি
হয় সকালে,
আজও স্মৃতি বহন করে
কালে-কালে।
বর্ণমালা আনলো ফিরে
বায়ান্নতে,
রক্ত ঝরে দামাল ছেলের
রাজপথে।

দয়াময় প্রভু

সাদিয়া আক্তার

তুমি মালিক তুমি খালিক
তুমিই প্রভু সব,
দোজাহানের বাদশা তুমি
তুমিই আমার রব।
রহম করো ওগো প্রভু
ওগো দয়াময়,
আমি অধম বান্দি তোমার
করছি অনুনয়।
ভুলে ভরা জীবন নিয়ে
তুলেছি দুটি হাত,
কবুল করে নিয়ো প্রভু
আমার মোনাজাত।

কাঠগোলাপ

রিফ আহমেদ শান

নাম শুনে ভেবেছিলাম তা পরিচিত গোলাপের মতো,
তবে দেখে বুঝলাম, এটা মোটেও নয় গোলাপের মতো।
দেখতে অনেক সুন্দর ও ভিন্ন রঙের,
আমি মায়ায় পড়েছি, ওই গোলাপের।

এই ফুল প্রায় অনেক উদ্যানে পাওয়া যায়,
অনেকের ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
এই গাছের শাখা-প্রশাখা হয়ে থাকে কম,
আর তাই শাখা-প্রশাখা হয় নরম।

বসন্তের শেষে ও গ্রীষ্মের শুরুতে এ ফুল ফোটে,
সকলে আনন্দিত হয়, ফুলের মৌ মৌ সুগন্ধে।
এ ফুলের সুগন্ধ তীব্র হয়ে থাকে রাতের বেলায়,
এ ফুল সাদা, হলুদ, গোলাপি, লালসহ একাধিক রঙের হয়।

বাংলার পটভূমি

সারমিন চৌধুরী

স্তম্ভিত নীল আকাশের পাদদেশে ভাসে
মুক্তিযুদ্ধের অজস্র স্মৃতি।
মৃত্যুর বুলেট কমাতে পারেনি স্বদেশ প্রেম
ইতিহাসে তাদের জয়-গীতি।

দমকা হাওয়া প্রাণের সুগন্ধ বয়ে বেড়ায়
রক্তচুষে অঙ্কুরিত মাঠের বীজ।
রাজপথে গুঞ্জে ত্যাগের মহিমান্বিত ধ্বনি
দেয়নি পরহস্তে পতাকার লিজ।

দেয়ালে খচিত হৃদয়ে গাঁথা মুজিব নাম
অমরত্বের সাক্ষী কর্মে-ই প্রমাণ।
হাটে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে কবিতা গান
শহিদের অবিস্মরণীয় অবদান।

বৃষ্টির ধারায় সম্ভ্রম হারানো আহাজারি
উদ্বেলিত শোকে কাতর বঙ্গবাসী।
বিনম্র শ্রদ্ধায় ঝুঁকে তাদের স্মরে নীরবে
চোখেমুখে ফোটে বিজয়ের হাসি।

পণ করেছি

মাহবুবা আক্তার তামান্না

বছর ঘুরে এলো
গুনাহ মাফের ক্ষণ,
ত্রিশটি রোজা রাখব
করেছি দৃঢ় পণ।

দিবস রজনিতে
করলে সিয়াম পালন,
দেবেন জানি প্রতিদান
আল্লাহ নিজ হাতে।

সদকা দেবো সবে
গরিব দুঃখীদের,
আমল হবে ভারী
সওয়াব পাবো ফের।

আমরা নবীন

মোহাম্মদ আবুল কাসেম

আমরা নবীন ছুটব বেগে
পেছন ফিরে দেখব না,
ঝড়ের বেগে সামনে যাব
কোথাও আমরা ঠেকব না।

আসবে যতই বাধার পাহাড়
ডিঙিয়ে তা যাব ঠিক,
রুখতে যারা সামনে যাবে
তাদের আমরা জানাই ধিক।

লড়াই করতে জীবন দেবো
দেখব আমরা তার শেষ,
হাসিমুখে পরব গলায়
যুদ্ধ করে বিজয় বেশ।

আমরা নবীন বুলেট-বোমা
ভয় করি না কোনোদিন,
দীপ্ত হয়ে সামনে যাব
শোধ করিতে দেশের ঋণ।

প্রতীক্ষা

অভিজিৎ দত্ত

চারিদিকে নৈরাজ্য আর হতাশা,
নেই যেন একটুও আলোর রেখা।
বিবেকের সূর্য জ্বলে উঠবে কবে,
ভালো মানুষেরা করছে তারই প্রতীক্ষা।

মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী,
একথা কজন মানি।
তাই পশুর মতো করছে কাজ,
মানুষ বলে পরিচয় দিতে,
লজ্জা লাগে আজ।

কবে হবে জীবনের উপলব্ধি?
কবে ঘটবে মানবের মুক্তি?
জীবনের সার্থকতা কীসে?
ভালো কাজে আর ত্যাগে।

এটা সে যতক্ষণ উপলব্ধি না করছে,
মানব জীবন অন্ধকারেই
নিমজ্জিত থাকছে।

নেয়ামতের মাস রমজান

উম্মে আইমান তৃষা

বছর ঘুরে রোজা এলো
সকল মুমিন তরে,
পুণ্য খাতা ভারী করে
পাড়ি জমাও ঘরে।

ইবাদতের মাসে মুমিন
রবকে বেশি ডাকো,
আমল করে হৃদয় থেকে
জান্নাতের ছবি আঁকো।

তোমায় হারানোর সন্ধিক্ষণে
রাশেদ নাইব

তোমার ক্লান্তিলগ্নে যদি কখনো,
আমার প্রয়োজন অনুভব না হয়;
তাহলে ভেবে নিয়ো আমি কখনো,
তোমার হৃদয়ে চাওয়া সেই,
কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি ছিলাম না।

তোমার অশ্রুঝরা মহূর্তে যদি,
কালো কেশের ফাঁকে ফাঁকে আমার,
হাতের আঙুলের ছোঁয়া অনুভব না হয়;
তাহলে ভেবে নিয়ো আমি তোমার,
মন ভোলানো সেই প্রিয়জন নই।

তোমার মন খারাপের দিনে,
গোধূলির আঁধারের সাথে সঙ্গী হয়ে,
নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়ার ক্ষণে,
যদি আমার নিকটস্থতা জানা না যায়;
তাহলে আন্দাজ করে নিয়ো–
আমি তোমার কল্পনার সুপুরুষ ছিলাম না।

তাহলে আমার স্মরণ তোমার বিষণ্নতা,
আমার উপস্থিতি তোমার বিরক্তিভাব।
আমাকে আমার মতো করেই হারিয়ে
যেতে দিয়ো,
আমরণ আমি বিহীন বেঁচে থেকো প্রিয়া!
অনুনয় তোমার নিকট আমি বিহীন–
নিজের যত্নটা আগের মতোই নিয়ো।

যারা অহং করে
শামসুল আরেফীন

যারা হবে খাঁটি মানুষ
হৃদয় তাদের স্বচ্ছ হয়,
তাদের অন্তর কলুষ মুক্ত
দিলে থাকে খোদার ভয়।

যাদের মনে অহং ভরা
মনটা অধিক কালো,
অহংকারটা দূর করিলে
জ্বলবে হৃদে আলো।

অহং নিয়ে করলে পুণ্য
সব-ই থাকে শূন্য,
মরার পরেও আমল-খাতা
থাকে জানি ক্ষুণ্ন।

মাটির ওপর নির্বোধ লোকে
ঘোরে দম্ভ করে,
বিনয়ী হয় জ্ঞানী লোকে
প্রজ্ঞা মনে ভরে।

আনারসের রাজ্যে একদিন

‹ ভ্রমণকাহিনি ›

• হুসাইন আহমদ

জীবন-জীবিকা, কর্মব্যস্ততা আর পেরেশানি আমাদের শরীর-মনকে ধীরে ধীরে নিস্তেজ, স্বাদহীন ও উপভোগ্যহীন করে দেয়। ফলে নিস্তেজ, ঝিমিয়ে পড়া, উদ্যমহীন এই শরীর ও মনকে সতেজ করার জন্য আমাদের নানান কিছু করতে হয়। নানান কিছুর মধ্যে এই যেমন ভ্রমণ করা। অবকাশ সময় অতিবাহিত করা, ইত্যাদি। এরমধ্যে ভ্রমণ আমাদের একটু বেশিই আনন্দ ও সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত উপহার দেয়। আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের শীরর-মনে সতেজতা ফিরিয়ে আনে। আনে আনন্দ, উৎফুল্লতা, উদ্যমতা ও একরাশ প্রশান্তিও। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি হচ্ছে—বনাঞ্চল। ফুল ফল আর সবুজ গালিচায় মোড়ানো বৃক্ষে ছাওয়া বনাঞ্চল। যেখানে আকাশের মেঘমালা খুব কাছাকাছি। যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজায়ন। গ্রামের বুক চিরে এঁকেবেঁকে চলে গেছে সরুপথ। উঁচুনিচু পথের পাশে ফুটে আছে রং-বেরঙের ফুল। কোথাও ঘন জঙ্গল বা সারি সারি বাগান। আনারস, কলা, বড়ই, পেঁপে ও পেয়ারা বাগান।

আবার কোথাওবা আম বাগানে ভরপুর দৃষ্টিসীমা। হঠাৎ হঠাৎ দুয়েকটা বাড়ি-ঘর। এরমধ্যে আছে কিছু সুন্দর সুন্দর মাটির ঘর। এককথায় অসাধারণ সৌন্দর্য ।

বলছিলাম টাঙ্গাইল জেলার আনারসের রাজধানী নামে পরিচিত মধুপুর উপজেলার কথা। এই উপজেলার ভ্রমণে মনে হয়েছে প্রকৃতিটা একদম ছবির মতন। আকাশটা সূর্যের স্বাভাবিক আলোয় ঝলমলে। বনের রাস্তাগুলোও নিরিবিলি আঁকাবাঁকা। একেকটা এলাকায় একেক ধরনের চাষাবাদ। ওই দূরে দূরে দুয়েকটা মাটির ঘর, সবমিলিয়ে অসাধারণ একটা পরিবেশ। কিন্তু এত এত সৌন্দর্যের মাঝেও সেখানে রয়েছে কিছু অসুন্দর, আছে কিছু কষ্ট ও বেদনার কথাও। তা হলো, দিনে-দুপুরে ছিনতাই, রাহজানি ও ডাকাতি। যদিও এখন তা অনেকটাই কমে গেছে।

আর এই অজপাড়াগাঁয়ের অনেকেই আক্ষরিক অর্থেই একেবারে সাদামাটা ও সহজ-সরল। তাদের এই সরলতাকে পুঁজি করে খ্রিষ্টান মিশনারি, কাদিয়ানি ও বিভিন্ন এনজিও কর্মীরা তাদেরকে অনায়াসে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। লোভ ও ভয়-ভীতি দেখিয়ে বিধর্মী বানাচ্ছে। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এই মানুষগুলোকে সহজেই তারা ধর্মান্তরিত করে ফেলছে। গ্রামের পর গ্রাম তারা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই তাদের মধ্যে প্রয়োজন সুশিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার উন্নতি। যদি সুশিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষায় তারা শিক্ষিত হতে পারে, তাহলে তারাও দেশের একজন সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে একদিন। বিপথগামী হয়ে ধর্মান্তরিত হবে না।

এই ভ্রমণটি ছিল আমাদের জন্য শখের ও শিক্ষামূলক। ভ্রমণের বাঁকে বাঁকে ছিল আমাদের জন্য শিক্ষার নানা উপকরণ। এই প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের মাঝেও যে ভয়াবহ কুৎসিত অসুন্দর কিছু থাকতে পারে, তা ভ্রমণ না করলে ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায় না। আবার পাহাড়ের বুকেও যে প্রকৃত কিছু মানুষের দ্বারা সাধারণ মানুষের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অসামান্য কিছু কিছু কাজ হচ্ছে, তাও জানা যেত না।

আর আমাদের এই ভ্রমণের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত যতটুকু সময় অবস্থান করেছি এবং যারা এই ভ্রমণের সঙ্গী মুফতি বশির আহমদ, মাওলানা আব্দুল আজীজ ও আমি হুসাইন আহমদ। এছাড়াও ভ্রমণকালে যারা যারা সহযোগী ছিলেন।

সবার কথাই সংরক্ষিত থাকবে আমাদের এই সুন্দর ভ্রমণটির মধুর স্মৃতি হিসেবে।

অতএব আমাদের নিস্তেজ, ঝিমিয়ে পড়া শরীর ও মনকে সতেজ করার জন্য মাঝেমধ্যে একটু আধটু ভ্রমণ করা উচিত। অবকাশ সময় অতিবাহিত করা উচিত। আর এই ভ্রমণগুলোও হোক আমাদের জীবনের জন্য আনন্দময় ও শিক্ষামূলক। সেই ভ্রমণের মাধ্যমেই ফিরে আসুক জীবনের চাঞ্চল্যতা, উদ্যমতা ও বিলুপ্ত মানবিকতা। তাহলেই আমাদের সকল ভ্রমণের সার্থকতা অর্জিত হবে।

শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

'(হে নবি) তাদের বলো–পৃথবীর বুকে ভ্রমণ করো এবং দেখো তিনি কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন, তারপর আল্লাহ (এসবকে) আবার জীবন দান করবেন। অবশ্যই আল্লাহ সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।' (সুরা আনকাবুত : আয়াত ২০)

পাথরখনিতে এক টুকরো বিকেল

(ভ্রমণকাহিনি)

• **রেজা কারিম**

অনেকদিন ধরেই ভাবছি দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়ায় অবস্থিত পাথরখনিটি দেখতে যাব। ছোট ভাই জহিরুল সেখানে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছে। তাই একদিন ওকে কল দিলাম। সে সাগ্রহে রাজি হলো। যাক ওর মাধ্যমে পাথরখনির অভ্যন্তরটা ঘুরে দেখা যাবে। ভাবতেই ভালো লাগল। আমার সঙ্গী হলেন আরও তিনজন। সুজাবত ভাই, নিয়ামত ভাই আর সুজারুল ভাই। তিনজনই আমার সহকর্মী। তারাও খুব খুশি। আমরা চারজনই পার্বতীপুরের খোলাহাটি থাকি।

দিনটি ছিল শনিবার। আমরা দুপুরের খাবারের পর তৈরি হয়ে গেলাম। খোলাহাটি বাজার থেকে আমি আর নিয়ামত ভাই একটা ভ্যানে করে চলে গেলাম চুতরির মোড়ে। ভাড়া জনপ্রতি দশ টাকা। মাঝে সুজারুল ভাইকে আমাদের ভ্যানে তুলে নিলাম। চুতরির মোড়ে গিয়ে দেখি সুজাবত ভাই অনুপস্থিত। চুতরির মোড়ের সঠিক উচ্চারণ জানি না। একেকজনের মুখে একেকরকম উচ্চারণ। আমি বলি চৈতির মোড়। মেয়েদের নাম। আমার দেওয়া

নাম। একটা বাস আসে। রংপুরগামী। আমরা এ বাস দিয়ে বদরগঞ্জের সিও বাজারে নামবো। সুজাবত ভাই ঠিক তখনই উপস্থিত হলেন। আমরা বাসে চড়ে সিও বাজারে নামলাম। জনপ্রতি ১৫ টাকা ভাড়া। সিও বাজার থেকে মধ্যপাড়ার অটোতে চড়ে চলে গেলাম মধ্যপাড়া পাথরখনির আবাসিকের সামনে। ভাড়া জনপ্রতি ৩০ টাকা। জহিরুল আবাসিকেই থাকে। আবাসিকের দুটো গেট; আমরা ২ নং গেটে জহিরুলের জন্য অপেক্ষা করছি। একটু পরেই জহিরুল চলে আসে। আমরা প্রথমে আবাসিক এরিয়াটি ঘুরে দেখার পরিকল্পনা করি। প্রচুর গাছপালায় পরিপূর্ণ এলাকা। একটা খেলার মাঠ। মাঠের এক কোণে শহিদ মিনার। একটা স্কুল আছে। আমরা স্কুলটা ঘুরে দেখি। পাশেই প্রাথমিক শাখা। চমৎকার কারুকার্য দিয়ে সাজানো স্কুলের দেয়াল। তার ঠিক পাশেই একটি হাসপাতাল।

ও বলা হয়নি, স্কুলের সামনের অংশে একটা শিশুপার্কের মতো। বিভিন্ন গাছপালায় পরিপূর্ণ এলাকাটিতে একটা প্রাণীর প্রতি মাঝেমাঝেই চোখ পড়ছিল। কাঠবিড়ালী। আবাসিক এরিয়ার একপাশে ফ্যামিলি কোয়াটার। সেদিকটায় যাইনি। মেইন রাস্তার পাশ ঘেঁষেই বিশাল পুকুর। দু'টি ঘাট আছে। ঘাটের একপাশে একটা বিশাল আমড়া গাছ। গাছভর্তি আমড়া।

আবাসিকের ১ নং গেট দিয়ে আমরা বাইরে বের হয়ে আসি। উদ্দেশ্য পাথরখনি। একটা ভ্যানে চড়ে অল্প দূরেই খনির প্রধান ফটকের সামনে থামি। জহিরুলের পরিচয়ে আমরা খনি এরিয়ায় প্রবেশ করি। একটা অদ্ভুত আনন্দ খেলে যাচ্ছিল মনের ভেতর। সবচেয়ে বেশি আনন্দিত লাগছে নিয়ামত ভাইকে। তিনি ছবি তোলায় মন দিলেন। গেটের ভেতরে প্রবেশের বামপাশেই পাথরের স্তূপ। আমরা পাথর হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছি। জহিরুল বলল, এ পাথর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের পাথর। পৃথিবীর সব পাথরই পাহাড় ভেঙে করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে খনি থেকে আহরিত পাথর ওসব পাথর থেকে অনেক ভালো মানের। তবে এ পাথর দ্বারা দেশের প্রায় ১০% চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। বাকি চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

গেট থেকে একটা দীর্ঘ রাস্তা ধরে আমরা ভেতরের দিকে যাচ্ছি। রাস্তার দু'পাশে মাথাকাটা দেবদারু গাছের সারি। স্তূপাকৃতি পাথরের দেয়ালে আমরা গ্রুপ ছবি তুলি। পাথরের বিশাল বিশাল স্তূপকে ছোটখাটো টিলার মতো মনে হয়। আরও একটু সামনে গেলে ডানপাশে একটা অফিস পাই। এ অফিসেই জহিরুল বসে। অফিসের ওপাশেই মূল খনিমুখ বা কূপ। খনির প্রায় এক হাজার ফুট নিচে গিয়ে শ্রমিকরা কাজ করে। লিফটের মাধ্যমে তারা উপর-নিচ যাতায়াত করে। শ্রমিকরা সবাই এদেশি। খনি এলাকার আশেপাশের মানুষ।

খনি থেকে বেল্টের মাধ্যমে পাথর উপরে উঠে আসে। বড় বড় পাথর। তারপর ভেঙে ছোট করা হয়। প্রয়োজনমতো বড়, মাঝারি ও ছোট। ট্রাকে করে এসব পাথর চলে যায় দেশের আনাচে কানাচে। খনিমুখের ওখানে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ। আমরা কেবল আশপাশ ঘুরে দেখতে পারব। বামপাশে দেখলাম বিদেশিদের আবাসিক ভবন। প্রতিটি তলার প্রতিটি রুমেই এয়ারকন্ডিশনার। জানলাম এদের বেশিরভাগই রাশিয়ান।

আমরা সামনে এগোই আর পাথরের সমারোহে রোমাঞ্চিত হই। ছোট পাথরের স্তূপ। তারপর মাঝারি সাইজের পাথরের স্তূপ। তারপর অনেক বড় বড় সাইজের পাথরের স্তূপ। এদিকে বড় পাথরের স্তূপগুলো বিশাল এরিয়া নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এ পর্যন্তই আমাদের সীমানা। আর সামনে যাওয়া নিষেধ। কী আর করা গোধূলির ম্লান হওয়া আলোতে পাথরের সাথে আকাশের মিতালি ঘটিয়ে বিদায় নিলাম।

খিলগাঁও, ঢাকা

সফরের সিদ্ধান্ত হলে বাড়ি থেক বের হওয়ার আগে দুই রাকাত নামাজ পড়া উত্তম। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সফরকারী তার পরিবারের জন্য দুই রাকাত নামাজের চেয়ে ভালো কিছু রেখে যায় না।

(মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা, হাদিস : ৪৯১২)

একটি বেদনাবিধুর রোজনামচা

তখন আমি *ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকায়* পড়াশোনা করতাম। সময়টা ছিল বছরের অনেকটাই শেষের দিকে। প্রতিদিনের মতো বাদ মাগরিব দরসগাহে বসলাম। কিছুক্ষণ পর মুফতী এনামুল হক কাসেমি হাফিজাহুল্লাহ আসবেন দরস দিতে। ছোটবেলা থেকেই দরস ফাঁকি দেওয়া আমার অপছন্দের ছিল। তাছাড়া এরকম বড় একটা প্রতিষ্ঠানে, বড়-বড় আসাতিজাদের দরসগাহে অনুপস্থিত থাকা—নিজের জন্য কল্যাণকর কিছু থেকে বঞ্চিতের কারণ মনে হতো। হঠাৎ দরসগাহের মাইকে ঘোষণা হচ্ছিল, 'আমিনুর রহমান, সিলেট'-কে অফিসে ডাকা হচ্ছে। ঘোষণা শুনে একধরনের ভীতি অনুভব করছিলাম। কারণ বসুন্ধরা মাদরাসায় সাধারণত বড় কোনো কারণ ছাড়া কাউকে অফিসে ডাকা হয় না। আতঙ্কে ভুগছিলাম। এ ঘোষণা যে আপনজনকে হারানোর ঘোষণা—কল্পনাও করতে পারিনি। গেলাম হুজুরের কাছে। যাওয়ার পর হুজুর কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন 'তোমার মামা আজ বাদ আছর ইন্তেকাল করেছেন'। হুজুরের কথা শুনে আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না। হুজুরের সামনেই ডুকরে ডুকরে কাঁদা শুরু করে দিলাম। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এই মামার মৃত্যুতেই প্রথম অনেক কাঁদলাম।

মামা আজ বেঁচে নেই কিন্তু তাঁর প্রতিটি কথা স্মৃতি হয়ে বেঁচে আছে আমার হৃদয়ের মণিকোঠায়। অন্যদের তুলনায় আমার প্রতি মামার মুহাব্বতের মাত্রাটা একটু বেশিই ছিল। তিনি আমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন। আমার পড়াশোনার প্রতি লক্ষ রাখতেন সবসময়। আমারও ইওচ্ছ ছিল মামার স্বপ্ন পূরণ করব, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু নিয়তির কী খেলা! স্বপ্নের কলিগুলো ফুল হয়ে ফোটার আগেই তিনি ঝরে গেলেন।

আমার মামা ছিলেন সুনামগঞ্জ জেলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি বিদ্যাপীঠ 'জামেয়া দারুল হাদীস সৈয়দপুর জগন্নাথপুর'-এর দীর্ঘদিনের সফল মুহাদ্দিস 'মুফতী শাহনুর আলী নাওয়্যারাল্লাহু মারক্বাদাহু'। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি হাদিসের খেদমত করে যান।

মাবুদ, যিনি এত দরদ নিয়ে তোমার প্রেম সরোবরে অবগাহন করতে নেমে গেলেন, তাঁকে তুমি দেখে রেখো। জান্নাতের সুশীতল ছায়ায় পরম মায়ার তাঁকে তুমি সুখে রেখো। পাঠকমহলে আমার মামার জন্য বিশেষ দোয়ার অনুরোধ রইল।

লেখক, আমিন হাসান

শিক্ষার্থী- এমসি কলেজ, সিলেট

মা নামক এলার্ম

আজ পহেলা রমজান। এ মাস অন্য মাসের মতো নয়; এটি বছরের শ্রেষ্ঠ মাস। প্রতিটি মুসলিম নরনারীর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান একটি মাস। এ মাসে প্রত্যেক মুসলিম নরনারীকে ৩০টি রোজা রাখতে হয়। ধর্মীয় দিক থেকে রোজা ঈমান ও তাকওয়া বৃদ্ধি করে। তাছাড়া এ মাস ঈদুল ফিতরের পূর্বাভাস দেয়।

আজ রমজানের প্রথম রোজা। তাই অন্যদিন থেকে আজ সেহরির সময় একটু আগেই জেগে উঠলাম। কেননা আজ জাগিয়ে দেবার মতো আমাদের বাসায় বড় কেউ নেই। প্রতি রমজানে সেহরির সময় হলেই আম্মু আমাদের সবাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। জানি, এবার এমনটা হবে না। কারণ তিনি এখন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন। এই কষ্টটা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। এই প্রথমবার আম্মুকে ছাড়া রমজান কাটাতে হবে। ভাবতেই শিউরে উঠছি বারবার। ছোট ভাই-বোন সবারই একই অবস্থা। এখন ওদের সান্ত্বনা দেবার মতো মনোবল এ মুহূর্তে আমার নেই।

রব কখন কোন পরিস্থিতিতে ফেলেন, তা আমাদের সবারই অজানা। সবকিছু চিন্তা করতে করতেই উঠে বসলাম। ফ্রেশ হয়ে ওজু সেরে সবাইকে ডেকে তুললাম। তখন আড়াইটা বাজে। আমি একেক করে দস্তরখানায় খাবার পরিবেশন করছিলাম আর ছোটবোন আমাকে সাহায্য করছিল। তারপর সবাই একসাথে খেতে বসলাম। ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই একসাথে বসে আছি। হঠাৎ বাসার এক প্রান্ত থেকে ফোনটা বেজে উঠল। দৌড়ে গিয়ে দেখি আম্মু কল দিয়েছেন; ফোনটা ধরলাম। রিসিভ করতেই অপর প্রান্ত থেকে আম্মুর গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আহা, কী যে শান্তি অনুভব হচ্ছে বলার মতো না!

যাহোক, আম্মু বলছিলেন—‘মামণি, সেহরির সময় হয়েছে, তোমরা সবাই উঠে পড়ো।’ এক মুহূর্তে সবকিছু যেন পরিবর্তন হয়ে গেল। এবারের রমজানেও মা নামক এলার্মটা আবার বেজে উঠল। ভাবছি, সারাটা জীবন যদি এভাবে কাছ থেকে এলার্মটা শুনতে পারতাম।

লেখিকা: সাদিয়া আক্তার
শিক্ষার্থী, কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ

নামহীন ঘটনা

বিকেলবেলায় হাঁটতে বের হতে না পারলেও নিয়ম করে সন্ধ্যাবেলায় ঠিকই বের হই। সারাদিন বদ্ধকক্ষে বসে থাকতে কার ভালো লাগে! লেখাপড়া, ঘুম ও নামাজ এতটুকুতেই কি আর জীবন চলে?
আজ বুধবার। বন্ধু হারুনের ফোন পেয়ে মগরিবের নামাজের পর বের হই। দুজন একসাথে হলে আমরা কথা বলি বর্তমান দেশ ও বিদেশের পরিস্থিতি নিয়ে। বলব বলে ঠিক করেই বলি এমন না। অনায়াসে চলে আসে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে আর কথার পিঠে কথা বলতে যেয়ে। বিশেষ করে মুসলামদের পরিস্থিতি নিয়ে বেশি কথা বলা হয়। তবে বই পড়া, রেফারেন্স, কোন বই কেমন ইত্যাদি কথা কিন্তু চলে না এমন না। সব ধরনের কথা চলে। আজও কথা বলতে বলতে হাঁটছিলাম রাস্তার ধারে। গন্তব্যের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। তবে যে রাস্তা বেয়ে হাঁটছিলাম, তা ছিল চকবাজারের রাস্তা। আর চকবাজার মানে চট্টগ্রাম প্যারেড ময়দান। ওখানেই বসা হয় প্রায় সময়।
দু'জন যখন প্যারেড ময়দানে প্রবেশ করছিলাম, তখনো আমাদের কথা শেষ হয়নি। হিন্দুস্তানের যুদ্ধ নিয়ে চলছে। যত আলাপ শাহ মুহাম্মাদ

ওয়ালী উল্লাহর ভবিষ্যৎ বাণীর উপর লেখা ছোট একটি বই নিয়ে। কী করে মুসলমানের শহর দখল করবে মূর্তিপূজারিরা। মুসলমানরা কী করে মূর্তিপূজারিদের শহর দখল করবে। মুসলিম শাসকরা তলে তলে কী করে মুনাফেকি করবে এসব নিয়ে চলছে আলাপ। হাঁটার গতি পরিবর্তন হয় কিন্তু আমাদের কথার টপিক চেঞ্জ হয় না। হঠাৎ প্যারেড পথে ঢোকার আগে একটি দৃশ্য দেখে বোবা হয়ে যাই দু'জন। সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে দুজন ছেলেমেয়ে চুমু খাচ্ছে আর তাদের সামনে দুজন ছেলে মাঠের দিকে চেয়ে আছে। চারিদিকে মানুষ হাঁটছে। অন্ধকার অতটাও নামেনি। দূরের বাল্বের আলোতে চেহারা দেখা না গেলে ঠিকই তাদের কর্মকাণ্ড বোঝা যাচ্ছিল।

আমি হারুনকে বললাম, দেখ কাণ্ড, মানুষ হাঁটছে চারিদিক আর এদের নোংরামি থামে না। বন্ধু আমাকে বলল, যিনা করার সময় মানুষের ঈমান যে শরীরে থাকে না তার প্রমাণ দেখ। তার কথাতে আমি সত্যি অবাক হলাম। আসলেই একজন মানুষের শরীরে যদি যিনা করার সময় ঈমান থাকে, তাহলে সে কখনোই যিনা করতে পারবে না। তাকে তখন লজ্জা ঘিরে ধরবে। কিন্তু এই ছেলেমেয়ে দু'জনের অবস্থা দেখে একটুও মনে হলো না—তাদের লজ্জা আছে। বন্ধু সামনে এগিয়ে গিয়ে দু'জনকে ধমক দিয়ে শাসাতে গিয়ে উলটো তাদের সঙ্গ দেওয়া দু'জন এসে আমাদের শাসিয়ে দিলো। নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছিলাম না আমি। একজন মুরুব্বি এসে আমাদের থামিয়ে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, এই নোংরা ছেলেপেলেদের দিকে তোমরা গেলে ক্যান?

অবাক দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম মুরুব্বির দিকে। খারাপ কাজে বাধা দেওয়াতে উলটো তিনিও বোঝাতে চেয়েছেন—আমরা বারণ করতে গেছি, তা আমাদের দোষ! আমার জীবনে খুবই কষ্টদায়ক নামহীন একটি ঘটনা।

লেখক, রুকনুদ্দিন মাহমুদ

পিতা-মাতার কদর

এই পৃথিবীতে যার মাথার উপর বাবার স্নেহ ও মায়ের মমতার ছায়া নেই, অর্থাৎ যে শৈশবে বা কৈশোরেই হারিয়েছে মাকে বা বাবাকে—সে-ই শুধু বুঝতে পারে পিতা-মাতার কদর। পিতা- মাতা তার জন্য কী নিয়ামত। এবং শুধু সে-ই বুঝতে পারে পিতার স্নেহ এবং মায়ের মমতার মূল্য। বিশেষ করে মা যার বেঁচে নেই, তার এই পৃথিবীর জীবন যে কত যন্ত্রণাময়, তা অন্য কেউ বুঝবে না। কারণ, তারা এমনভাবে চলে যে, তারা তাদের দুঃখ-কষ্ট কাউকে বুঝতে দেয় না।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমার মাথার উপর বাবার স্নেহ ও মায়ের মমতার আঁচল এখনো রেখেছেন। আর এটাই আমার প্রত্যাশা যে, দীর্ঘদিন তাঁরা যেন বেঁচে থাকেন, সুখ-শান্তির সঙ্গে। তাঁরা আমার জন্য নিয়ামত।

আম্মু আজ বড় ফুফির বাড়িতে গেছেন। গেছেন মাত্র একদিনের জন্য। রাতটা থেকে আগামীকাল সকালেই চলে আসবেন। মাত্র একদিনের জন্য আম্মু নেই, তাতেই সবকিছু যেন কেমন হাহাকার করছে। বিষণ্নতার কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আমার মনের আকাশ। চারদিক থেকে যেন ভেসে আসছে একটি সুর মা নেই! মা নেই!

লেখক, জাবেদ বিন তৈয়ব

নবীনকণ্ঠ পরিবার

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী হা.
মুহাদ্দিস, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা

মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী
গবেষক ও অনুবাদক

হাছিব আর রহমান
সম্পাদক ও জার্নালিস্ট

মাকামে মাহমুদ
সম্পাদক ও প্রুফরিডার

কাজী মারুফ
কবি ও গীতিকার

আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফী
খতিব ও কলামিস্ট

মাওলানা মাহফুজ হুসাইনী
সহ-সম্পাদক, বাংলাদেশের খবর

মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবায়ের
শিক্ষক, মারকাযুত তারবিয়াহ বাংলাদেশ,সাভার, ঢাকা

মুহা. সায়েম আহমাদ
কলামিস্ট ও সংগঠক

রাশেদ নাইব
কবি ও লেখক

বিন-ইয়মিন সানিম
শিক্ষক ও প্রুফরিডার

মুফতী মাসউদ আলিমী
শিক্ষক, খতিব ও অনুবাদক

মুফতী সাইফুল্লাহ বিন কাসিম
শিক্ষক ও লেখক

মুফতী ইমদাদুল্লাহ
শিক্ষক ও অনুবাদক

মাও. হাবীব উল্লাহ
পরিচালক, তিজারাহ আসলী

আনিসুর রহমান আফিফি
শিক্ষক ও লেখক

মুহা. আব্দুর রশীদ
প্রাবন্ধিক ও লেখক

শেখ মুহাম্মাদুল্লাহ আহনাফ
সম্পাদক ও শিক্ষক

জুবায়ের আহমেদ
লেখক

ওলিউল্লাহ তাহসিন
শিক্ষক, মারকাযুসসুন্নাহ, উত্তরা, ঢাকা

জাবের মাহমুদ
শিক্ষক

শামসুল আরেফীন
ছড়াকার

হুসাইন আহমদ
শিক্ষক ও লেখক

তাশরীফ আহমদ
শিক্ষক ও লেখক

তাওসীফ আহমাদ
শিক্ষক ও লেখক

উসমান বিন আব্দুল আলিম
সম্পাদক, নবীনকণ্ঠ

৩য় বর্ষ । ৩য় সংখ্যা । মার্চ, ২০২৪ খ্রি.

- আলাদা আলাদা আমরা এক বিন্দু, কিন্তু একত্রে আমরা এক সাগর।
- ঐক্যের প্রধান হাতিয়ার: আমানতদারিতা, নম্রতা ও বিশ্বস্ততা।

সহযোগিতায়

আস্থা ও বিশ্বাসের প্লাটফর্ম

তিজারাহ আসলী

(বাদাম, অরিজিনাল মধু, পারফিউম, ঘি, থ্রি-পিস ও শাড়ি ইত্যাদি)

প্রোপাইটার :

মাওলানা হাবিব উল্লাহ

ইমেইল : md.habibullah8264@gmail.com

নাম্বার : ০১৮৬৬৯৫৬৭৯১

বি. দ্র.

বাংলাদেশের যেকোনো জেলা ও থানা থেকে কুরিয়ারে অর্ডার নেওয়া হয়। লক্ষ্মীপুর ও ঢাকা জেলায় হোম ডেলিভারি দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের জনপ্রিয় অনলাইন পোর্টালের মধ্যে অন্যতম একটি হলো;

দৈনিক দেশচিত্র

যেখানে বাঙালি সেখানেই আমরা

সৌজন্যে:

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম

(শুদ্ধ লেখনীর ধারায় সুদূর অগ্রযাত্রা)

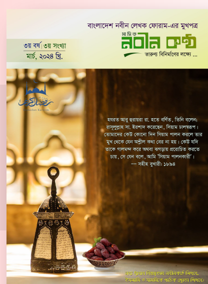

ব্যবস্থাপনায়

ও. এম. প্রকাশনী

(তারুণ্যের সৃজনশীলতা বিকাশে দৃঢ় প্রত্যয়)

ইমেইল: nobinkanthobnlf@gmail.com

যোগাযোগ: 01789204674